রক্তের নেশা
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

রক্তের নেশা-৭২

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

তুমি এমনি করে দিনের পর দিন নর হত্যা করে যাবে? বলো এতে তুমি কি আনন্দ পাও? মনিরা দু'হাতে স্বামীর জামার আস্তিন চেপে ধরে ঝাকুনি দেয়—বলো তুমি কি আনন্দ পাও?

মনিরা তুমি বুঝবেনা। শুধু এ টুকু জেনে রাখো তোমার স্বামী অহেতুক নর হত্যা করে না।

মিঃ ফিরোজ রিজভী এবং তার কয়েকজন সহকারী কি অপরাধ করেছিলো তোমার কাছে? কি অপরাধ করেছিলেন ইন্সপেক্টর ইয়াসিন? কি অপরাধ করেছিলেন মিঃ গিয়াস উদ্দিন? বলো এরা কি অপরাধ করেছিলো যার জন্য তুমি এদের এভাবে হত্যা করেছো? চুপ করে রইলে কেনো জবাব দাও আমার কথার?

মনিরা সব কথা সব সময় বলা যায় না।

তোমাকে আমি পুলিশের হাতে স্বঁপে দেবো।

তাই দাও, তাই দাও আমাকে, পুলিশের হাত তুলে দাও। কিন্তু জেনে রাখো মনিরা পুলিশের সাধ্য নাই এই রক্তের নেশা বন্ধ করে। মনিরা শোন, ফিরোজ রিজভীকে আমি কেনো হত্যা করেছি। সে দেশের মানুষের চোখে একজন মহৎ মহান ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে।

তবু তুমি তাকে হত্যা করেছো?

হাঁ করেছি, জানো কেনো করেছি? মিঃ ফিরোজ রিজভীর মত অসাধু ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে না। তার ব্যবসা ছিলো দেশের জনগণের মুখের আহার হরণ করে গোপনে বিদেশে চালান দেওয়া। এতে সে লক্ষ লক্ষ টাকাই পেতোনা, পেতো কোটি কোটি টাকা। আর সেই টাকা সে ইচ্ছামত জলস্রোতের মত খরচ করতো তার ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। দেশের স্বনাম ধন্য ব্যক্তিদের সে সব সময় খুশি রাখতো যাতে দেশবাসী জানেন সে মহৎ আর মহান ব্যক্তি। মনিরা আরও শোন, শুধু ফিরোজ রিজভী নয় তার সহকারীগণ সবাই তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলোনা। তারা দিনের পর

দিন দেশকে শোষণ করে নিঃসার করে ফেলছিলো। তিল তিল করে চুষে নিচ্ছিলো এরা অসহায় মানুষের বুকের রক্ত।

এতো সব করতো, কিন্তু পুলিশ বা দেশের জনগণ কিছু জানতো না।

জানতো সবাই কিন্তু কারো বলবার ক্ষমতা ছিলোনা কারণ তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য ধনবান মানুষ। দেশবাসী প্রায় সবাই কিছু না কিছু ঋণী তার কাছে। পুলিশ মহল সদা উপকৃত মাঝে মাঝে খানা পিনা চলতো তার বাস ভবনে। তাছাড়া কখনও কখনও বড় সাহেবের বাসায় বা পুলিশ প্রধানের বাংলোয় উপঢৌকন আসত কাজেই তাদের মুখ বন্ধ। এ সব দেখেও না দেখার অভিনয় করতে বাধ্য ছিলেন তাঁরা।

সত্যি বলছো?

মিথ্যা বলবো স্ত্রীর কাছে? কেনো মিথ্যা বলবো মনিরা। তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, আমার কথাগুলো মিথ্যা না সত্য। দেশ আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে দেশের মানুষ উন্মাদ হতে আর বেশি বিলম্ব নাই। বনহুর থামলো, তারপর মনিরার হাত ধরে খাটের পাশে এসে বসলো, মুখ-মন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে—বলতে শুরু করলো সে—দেশে ফসল পূর্বের চেয়ে কোন অংশে কম হচ্ছেনা। কৃষক সমাজ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসশ্য উৎপাদন করে চলেছে কিন্তু দিনের পর দিন খাস্যসশ্যের মূল্য কমার চেয়ে দশগুণ বেড়ে গেছে বা যাচ্ছে। কৃষকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করলেও তারা সে ফসলে উদর পূর্ণ করতে সক্ষম হচ্ছেনা। কারণ মুনাফাকারী, কালোবাজারী দল রক্ত চোষা বাদুড় বা ভ্যাম্পায়ারের মত ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র। চাষীরা উৎপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে এরা নানা ছলনায় কলা কৌশলে এ সব খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে নেয়, তারপর করে গুদামজাত। পরে লোক চক্ষুর অন্তরালে ট্রাক বোঝাই করে চালান দেয় দেশের বাইরে। হঠাৎ যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এসব মাল আটক হয় তখন টেলিফোন কিংবা চিঠি আসে পুলিশের হেড অফিসে। পুলিশ অফিসার জানতে পারেন এ মাল সাধারণ কোন ব্যক্তির নয়, দেশের স্বনামধন্য কোন মহান জনের, কাজেই বিনা কসুরে খালাস।

মনিরা নির্বাক হয়ে শুনতে থাকে স্বামীর কথাগুলো।

বনহুর বলেই চলেছে—শুধু আজ নয়, চিরদিন এই অনাচার অত্যাচার অবিচার চলে এসেছে ক্রমান্বয়ে দেশবাসীর উপর। নিস্পেষিত হয়েছে এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণী মানুষের কাছে। জন্মের পর থেকেই দেখছি শুধু হাহাকার আর হাহাকার। ক্ষুধার্তের করুন ক্রন্দন আমাকে বিচলিত করেছে। মনিরা তুমি বুঝবে না, তোমার মত অবস্থায় যারা আছে তারা বুঝবেনা সেই সব মানুষের ব্যথা। এই দেশের বুকেই কত নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যাচ্ছে। কত মা সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে না পেরে সামান্য টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে তার কত আদরের ধনকে। কত মা ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে নয়নের মণিকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে নিজেও ঝাপিয়ে পড়ছে কুপের গভীর অতলে। বলো বলো মনিরা হিসাব রাখো এই সব অসহায় জননীদের। কত পিতা, স্ত্রী কন্যা আহার যোগাতে না পেরে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে পৃথিবীর এ অভিযোগ থেকে মুক্তি নিয়েছে। আরও কত শুনতে চাও তুমি? এই দেশের আনাচে কানাচে শত শত অনাহারী মানুষ আজ তিল তিল করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। মনিরা এদের এ দুর্দ্ধশার জন্য দায়ী কারা? কোন শ্রেণীর মানুষ তারা? চুপ করে আছো কেনো, জাবাব দাও, তারা কারা?

স্বামীর কঠিন মুখমন্ডল আর দৃঢ় কণ্ঠস্বরে—মনিরাকে স্তম্ভীত করে তোলে, ভাবে মনিরা, সত্যি তো দেশের ক'জন মানুষের সন্ধান তারা নিতে পারে? কত নিরীহ মানুষ আজ অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে কে তার হিসাব রাখে। কিন্তু এ সবের জন্য দায়ী কারা?

জানি, বলতে পারবে না, জবাব দিতে পারবে না আমার প্রশ্নের। কারণ যে ব্যথিত নয় সে কোন দিন ব্যথার কি জ্বালা তা বুঝবে না। তোমরা উপর তলার মানুষ নিচের তলার মানুষের অবস্থা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হবার কথা নয়।

তুমি আমাকে ভুল বুঝছো?

ভুল নয় সত্যি। ক্ষুধার কি জ্বালা কি কষ্ট কোন দিন তা অনুভব করছো? সে অবস্থা কোন দিনই আসবে না উপর তলার মানুষের কারণ তারা নিচের তলার মানুষের বুকের রক্ত শোষণ করেই তো উপর তলার মানুষ হয়েছে।

তুমি এসব কি বলছো?

সত্যি কথা বলছি মনিরা, না বলে আজ তুমি তোমার স্বামীকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইতে না। আজ যে সত্য কথা বলে— ন্যায় নীতি যে মেনে চলে তাদের স্থান নেই সভ্য সমাজে। কারণ আজকাল সত্য কথা বলা, ন্যায় নীতি মেনে চলা অপরাধ। মিথ্যা জাল-জুয়াচুরী যারা করে, যারা একজন আর একজনের হাত চুষে খায় তারাই সমাজের মেরুদন্ড।

কিন্তু আর বেশি দিন এ অবিচার চলবে না। বললো মনিরা।

—বনহুরের কণ্ঠ নরম হয়ে এলো, এবার সে বললো—মনিরা এ ধারণা তোমার ভুল, কারণ যুগ যুগ ধরে এ অবিচার আসছে। এক দল মানুষ আর একদল মানুষকে নিস্পেষিত করে সমাজে স্বনামধন্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে এসেছে। তারা কোন দিনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয়নি আর এক দলকে।

এমনিই কি চিরদিন চলবে? একদল চির দিন আর এক দলের পায়ের নিচে পিষে মরবে?

প্রতিবাদ এসেছে! সেই নিস্পেষিত দলটির মনে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে তাদের আত্মচেতনা। কেনো তারা কি মানুষ নয়? তাদের দেহে কি রক্ত মাংস নেই? কিন্তু যখনই তাদের মধ্যে এই আত্মচেতনা জেগেছে তখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, উন্মাদ হয়ে উঠেছে, কারণ তারা আর নিস্পেষিত হতে রাজি নয়। কিন্তু তারা প্রতিদানে কি পেয়েছে জানো? ষ্টিম রোলারের কষাঘাত। হয় চাবুক নয় গুলি। কোন দিনই উপর তলার মানুষ নিচের তলার মানুষকে মাথা তুলতে দেয়নি।

ওগো কোনদিনই কি এর সমাধান হবে না?

হয়তো হবে, সেদিন কবে আসবে জানি না। যেদিন একদল আর একদলকে শোষণ করার সুযোগ পাবে না পারবেনা একদল আর এক দলকে পিষে মারতে। মনিরা নরহত্যা আমি করতে চাই না। যারা নর হত্যা করে তাদের আমি ঘৃণা করি, শাস্তি দান করি কিন্তু যখন আমি দেখি ঐ ব্যক্তি সব কিছু সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন আমি বেছে নেই তাকে পৃথিবী থেকে সরানোর মুক্ত পথ। যাতে সে ব্যক্তি আর কাউকে শোষণ করতে না পারে বা কাউকে নিস্পেষিত করতে না সক্ষম হয়। হত্যা আমার পেশা নয় নেশাও

নয়। আইন আদালত যাকে শায়েস্তা করতে পারে না, আমি শুধু তাকে শায়েস্তা করি। দেশের জনগণের মুখের আহার যারা কেড়ে নিয়ে ধনকুবেরু বনে যায়, তাদের আমি ক্ষমা করি না। মিঃ ফিরোজ রিজভী ও তার দলবল সবাই ছিলো এক নং চোরা কারবারী, মিঃ গিয়াস উদ্দিন তার প্রধান সহকারী। মিঃ ইয়াছিনের কথা বললে, তিনি চোরা কারবারী ছিলেন না কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বাস ঘাতক। দস্যু বনহুর কোন দিন বিশ্বাস ঘাতককে ক্ষমা করে না।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর তারপর বলে উঠে—মনিরা বাইরে ডাক্তার হুসাইন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তুমি এমনি করে আর কতদিন পালিয়ে পালিয়ে আসবে আর যাবে বলো তো?

হয়তো এমনি করেই আমার জীবন কেটে যাবে। মনিরা...... গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

কতদিন স্বামীকে নিবিড়ভাবে কাছে পায়নি। স্বামীর প্রশ্বস্ত বুকে নিজেকে বিলিয়ে দেয় মনিরা।

❑

গভীর রাত।

মিঃ হেলালী আপন মনে কাজ করছিলেন। সম্মুখ টেবিলে রাশিকৃত কাগজপত্র ছড়ানো।

পাশের ত্রিপয়ায় টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে।

খট্ করে একটা শব্দ হলো।

চমকে চোখ তুললেন মিঃ হেলালী, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আপনি।

একমুখ হেসে বললো বনহুর—কেউ কোনদিন আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেন না অথচ আপনি আমাকে বড় লজ্জা দেন মিঃ হেলালী।

কারণ সবাই আপনাকে ভুল বোঝে, তাই......হাত বাড়ায় মিঃ হেলালী দস্যু বনহুরের দিকে।

দস্যু বনহুরও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মিঃ হেলালীর সঙ্গে।

মিঃ হেলালী বললেন—বসুন।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ হেলালী টেবিল থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন—নিন।

বনহুর সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজতেই মিঃ হেলালী সিগারেট লাইট জ্বালিয়ে ধরলেন।

বনহুর অগ্নিসংযোগ করলেন তার সিগারেটে তারপর একমুখ ধূঁয়া ছেড়ে বললেন—মিঃ হেলালী, কাগজপত্র ঘেঁটে দেশের দুস্কৃতিকারীদের খুঁজে বের করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। ডি আই বি পুলিশ ছড়িয়ে দিন এবং কৌশলে সন্ধান নিয়ে দেখুন আপনাদের আশে পাশেই পরম পরিচিতজনদের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে দুস্কৃতিকারী দল।

একথা মিথ্যা নয়, কিন্তু আজকাল লোক চেনাই মুস্কিল। মুখে বড় বড় বুলি আওড়িয়ে মহৎ মহৎ বাণী শুনিয়ে অনেক শয়তান সাধু সেজে দেশ ও দশের সর্বনাশ করে চলেছে।

শুধু সর্বনাশ নয় মিঃ হেলালী, দেশকে এক চরম অবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। অহঃরহঃ এরা দেশের জনগণের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আমি চাই আপনি পুলিশ মহলকে এ ব্যাপারে সচেতন হবার জন্য অনুরোধ জানাবেন। দুস্কৃতিকারী যত স্বনাম ধন্য ব্যক্তিই হন না কেনো, আইনের চোখে তারা অপরাধী, কাজেই ক্ষমা করা কাউকে চলবে না। আমি জানি পুলিশ মহলের মধ্যেও অনেক দুস্কৃতিকারী রয়েছেন যাদের সহায়তায় কাজ হাসিল করছে শোষক দল।

আপনি ঠিক বলেছেন।

মিঃ হেলালী দেশের দুস্কৃতিকারী দমনে প্রথমে পুলিশ মহলের প্রত্যেকটি লোককে দুস্কর্ম মুক্ত করতে হবে। এ জন্য পুলিশ প্রধানদিগকে অত্যন্ত সতর্কবান হতে হবে, যদি কেউ কোন অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে, যেন ক্রমান্বয়ে তারা সৎ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। হাঁ, আর

একটি কথা দেশ থেকে যতক্ষণ ঘুষ প্রথা দূর না হয় ততক্ষণ দেশের উন্নতি সাধন হবে না!

কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালো বনহুর, চোখে মুখে তার খুশি ভরা দীপ্ত ভাব।

হাত বাড়ালো সে মিঃ হেলালীর দিকে।

মিঃ হেলালীও হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন—আপনার কথাগুলো স্মরণ থাকবে।

একজন পুলিশ প্রধান আর একজন দস্যু প্রধান মিলে যখন করমর্দন করছিলো তখন অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতরণ হয়েছিলো।

বনহুর যে পথে এসেছিলো সেই পথে চলে গেলো।

মিঃ হেলালী আসন গ্রহণ করলেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে টেবিলে ফোন বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং শব্দে।

মিঃ হেলালী রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানের কাছে ধরতেই ভেসে এলো মিঃ জায়েদীর কণ্ঠস্বর......হ্যালো মিঃ হিলালী আপনি শীঘ্র চলে আসুন, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে......আমি পুলিশ অফিস থেকে ফোন করছি......

মিঃ হেলালী বলে উঠলেন...স্যার দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে...বলেন কি স্যার...

...হাঁ, আপনি চলে আসুন...এখানে আমি এবং মিঃ হারুন মিঃ শওকত এবং আরও কয়েকজন...অপেক্ষা করছি...

মিঃ হেলালীর মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো কারণ তিনি জানেন যাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ অফিসে আনা হয়েছে সে দস্যু বনহুর নয় কারণ দস্যু বনহুর এই মাত্র তার সম্মুখে উপস্থিত ছিলো, সে কয়েক মিনিট হলো মাত্র বিদায় নিয়ে গেছে।

তবু না গেলে নয়, মিঃ হেলালী খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লেন। ও'ভার কোটটা গায়ে দিয়ে নেমে এলেন নিচে।

একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ হেলালী—গাড়ি বের করতে বলো।

পুলিশ গিয়ে ড্রাইভারকে জানালো।

ড্রাইভার গাড়ি বের করলো।

মিঃ হেলালী গাড়িতে চেপে বসে বললো—পুলিশ হেড্ অফিসে চলো।

গাড়ি ছুটলো।

অফিসে পৌঁছে দেখলেন মিঃ হেলালী রাত দুপুরেও ভীড় জমে গেছে অফিস প্রাঙ্গনে। প্রায় জন সমুদ্র বলা চলে, গাড়ি অফিসের সম্মুখে থামতেই দু'জন পুলিশ সেলুট করে সরে দাঁড়ালো।

মিঃ হেলালী কিছু অবাক না হয়ে পারলেন না, তিনি মনে মনে হাসলেন তারপর অফিস কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।

অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ জায়েদী মিঃ হাসেম মিঃ কাওসার এবং মিঃ শওকতকে দেখতে পেলেন। তারা সবাই ব্যস্তভাবে কি সব আলোচনা করছেন। এমন কি মিঃ জাফরীও আছেন সেখানে।

মিঃ হেলালী জানেন আর কেউ দস্যু বনহুরকে না চিনলেও মিঃ জাফরী তাকে চিনবেই কিন্তু তিনি যখন উপস্থিত আছেন তখন নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার কৃত ব্যক্তিই যে দস্যু বনহুর তাকে কোন সন্দেহ নাই। তবে কি করে তা সম্ভব হয় কারণ মিঃ হেলালীর কাছ থেকে মিনিট কয়েক পূর্বে দস্যু বনহুর বিদায় নিয়ে যাবার পর পরই ফোনে মিঃ জায়েদী তাকে জানালেন, আপনি শীঘ্র চলে আসুন দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে। কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিলোনা তার, তবু এলেন, না এসে কোন উপায় ছিলোনা। মিঃ জায়েদীর আহ্বান উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এসে দেখছেন ব্যাপারটা সত্যই হবে।

মিঃ হেলালীকে দেখে পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদী বললেন— এসেছেন মিঃ হেলালী।

হাঁ স্যার, না এসে পারি? আশ্চর্য দস্যু বনহুর তাহলে শেষ পর্যন্ত বন্দী হলো? মিঃ হেলালী কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—দস্যু বনহুরকে কি করে এবং কোথায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো স্যার জানতে পারিনি এখনও?

মিঃ জায়েদীই বললেন—সে সব কথা পরে শুনবেন চলুন আগে দস্যু সর্দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা যাক।

মিঃ হেলালীর ভ্রু কুঞ্চিত হলো, সত্যিই কি তাহলে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে। কেমন যেন একটা দ্বন্দ্বতায় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

মিঃ জায়েদীর সংগে মিঃ হেলালী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পূর্বে তাকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এখনও হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

কয়েকটা পুলিশ ভ্যান অপেক্ষা করছে পুলিশ অফিস প্রাঙ্গনের এক পাশে। সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স মেশিনগান উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ অফিসের চার পাশে।

মিঃ জাফরী একমনে সিগারেট পান করে চলেছেন। তাঁকে বেশ প্রসন্ন মনে হচ্ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার সহ মিঃ হেলালী এসে পৌঁছলেন পুলিশ অফিসের লৌহ কারাগারের সম্মুখে।

মিঃ হেলালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছেনা দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে।

লৌহ ফটকের ১নং দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করবেন পুলিশ প্রধানগণ।

২নং লৌহগেট তারপর ৩নং ৪নং পাঁচ নম্বর লৌহফটকের ওপারে বন্দী করে রাখা হয়েছে দস্যু বনহুরকে।

মিঃ জায়েদী এবং মিঃ হেলালী সর্বাগ্রে তাদের পিছনে রয়েছে কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

লৌহকারা কক্ষে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন মিঃ হেলালী। অদূরে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে আছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। চোখ দুটো তার মুদিত, হাতে এবং পায়ে মোটা জমবুত লৌহ শিকলে আবদ্ধ।

মিঃ হেলালী স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে একি করে সম্ভব হলো। দস্যু বনহুর কি করে এরেষ্ট হলো। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান মাত্র তার নিকট হতে বিদায় নিয়ে ছিলো সে, কিন্তু....

মিঃ জায়েদী বললেন...বড় ক্লান্ত তাই ঘুমাচ্ছে।

মিঃ হেলালী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—আশ্চর্য বটে।

মিঃ জায়েদী বললেন—একে আজই হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া দরকার বলে মিঃ জাফরী জানিয়েছেন।

মিঃ হেলালী কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চললেন।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণও ফিরে চললেন।

অফিস কক্ষে ফিরে আসতেই বললেন মিঃ জাফরী—আর মোটেই বিলম্ব করা উচিৎ নয় আজ রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

মিঃ জায়েদী বললেন—রাতে পাঠানো কি ঠিক্ হবে মিঃ জাফরী? দস্যু বনহুরের অনুচরগণ কোন রকম হামলা করে বসতে পারে।

সে কথা সত্য কিন্তু দিনে জনগণের যে ভীড় হবে তা রাতের জন সমুদ্রের চেয়ে শতগুণ বেশি, কাজেই—আমার মতে রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানোই ভাল হবে। মিঃ জাফরী কথাগুলো বলে আর একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো ব্যাপার নিয়ে পুলিশ মহল নানারকম আলাপ আলোচনা চললো। সংগে সংগে টেলিফোনে সংবাদ সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়লো।

বিশেষ করে পুলিশ বাহিনী এবং কান্দাই মিলিটারী ফোর্স শসব্যস্ত হয়ে উঠলো।

কান্দাই প্রেসিডেন্ট ভবনেও সংবাদ পৌঁছে গেলো। দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে, তাকে রাতে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস বন্দী শালায় বন্দী করে রাখা হবে না হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে? প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট আবু গাওসের জানালেন—রাতেই দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো উচিৎ, না হলে সে পুলিশ অফিস বন্দীশালা থেকে পালাতে পারে।

প্রেসিডেন্টের কথা অমান্য করা যায় না কাজেই দস্যু বনহুরকে রাতেই হাঙ্গেরী কারাগারে পাঠানো সাব্যস্থ হলো।

পুলিশ মহল এবং মিলিটারী বাহিনী মিলে প্রস্তুতি চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শহরের রাজপথ মিলিটারী ট্রাক আর পুলিশ ভ্যানে গম গম করে উঠলো। পুলিশের সাংকেতিক হুইসেল আর বাঁশীর শব্দে ভরে উঠলো চারিদিক।

প্রতিটি বাড়ির আলো নীভে গেলো। বাড়ির লোকজনের মনে জাগলো আতঙ্ক। না জানি দস্যু বনহুরকে পুলিশ মহল আটক করে রাখতে সক্ষম হবেন কিনা কে জানে।

স্ত্রী স্বামীর বুকে মুখ লুকালো, ওগো দস্যু বনহুর যদি পালাতে সক্ষম হয় তাহলে কার বাড়িতে ঢুকে পড়বে কে জানে। যদি কোন মেয়েকে সম্মুখে পায় তার অবস্থা কি হবে।

স্বামী স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরলো, কেউ বা পিস্তল কেউ বা ছোরা যে যা পারলো অস্ত্র প্রস্তুত করে নিয়ে বসে রইলো। রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত কারো স্বস্তি নেই।

মায়ের বুকে কুকড়ে আছে সন্তান, দস্যু বনহুর যদি পুলিশ বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে পালায়। যদি এসে হাজির হয় তাদের বাড়ির তিন তলার ছাদে তখন কি হবে। সবার মনেই ভয় আর উদ্বিগ্নতা।

পুলিশ প্রধান থেকে সাধারণ পুলিশ পর্যন্ত নিদ্রাহীন ভাবে ছুটোছুটি করে চললো। কেমন করে কিভাবে দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে এই হলো সবার চিন্তা। পথের দু'ধারে মিলিটারী ফোর্স এবং সশস্ত্র পুলিশ প্রহরারত রইলো।

কোন মুহূর্তে, কখন, দস্যু বনহুরকে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে সেই আদেশের প্রতিক্ষায় রইলো পুলিশ বাহিনী।

ভোর রাতে দস্যু বনহুরকে কান্দাই হেড পুলিশ অফিস থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

পরদিন সংবাদপত্রে বিরাট আকারে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সংবাদ প্রকাশ পেলো।

মিঃ জাফরী নিজে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারকারী পুলিশ অফিসার মিঃ নাসের উদ্দিন হাফ্সীকে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিয়ে গেলেন এবং একটি অনুষ্ঠানে সমস্ত পুলিশ মহলের সম্মুখে প্রেসিডেন্ট নিজ হস্তে ঐ চেক দান করলেন হাফ্সীর হস্তে।

ফটোগ্রাফার রিপোর্টার অবিরত মিঃ হাফ্‌সীসহ প্রেসিডেন্ট আবু গাওসারের ফটো গ্রহণ করেন চললো। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা ধরনের ফটো ছাপা হলো।

দেশে আবার একটা স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করলো। তবে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় সবাই খুশি হলো না, অনেকেই নীরবে চোখ মুছলো।

চৌধুরী বাড়িতে নামলো আবার একটা দুঃচিন্তার ছায়া। তবে প্রকাশ্য এ ব্যাপারে নিয়ে কেউ আলাপ করতে পারতো না কারণ এখন নূর বুঝতে শিখেছে কাজেই সব ব্যথা গোপনে হজম করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলো না।

মরিয়ম বেগমকেও জানালো হলোনা কথাটা কারণ তিনি সবেমাত্র কঠিন অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। একেই তো তিনি পুত্র চিন্তায় অস্থির তারপর আবার যদি তিনি এ কথা শোনেন তাহলে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না কিছুতেই।

শুধু সরকার সাহেব আর মনিরা মিলে গোপনে চলতো আলা আলোচনা।

নীরবে চোখ মুছতো মনিরা।

নূর যখন ছোট ছিলো তখন হয়তো সে নিজেই স্বামীর বন্দী ব্যাপার নিয়ে ছুটে গেছে হাঙ্গেরী কারাগার অবধি। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়, নূর জানতে পারলে হয়তো বিভ্রাট ঘটতে পারে।

বুকের ব্যথা বুকে চেপে রইলো মনিরার।

এদিকে পুলিশ মহল নিশ্চিন্ত হলো, আর শহরের সর্বত্র কড়া পাহারা প্রয়োজন হবে না। আর চৌধুরী বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকতে হবে না সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে।

কিন্তু মিঃ হেলালী কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বার বার তাঁর কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দস্যু বনহুরের সেই রাতের কথাগুলো—"দেশের দুস্কৃতি দমনে প্রথমে পুলিশ মহলের প্রতিটি লোককে দুস্কর্মমুক্ত করতে হবে। এজন্য পুলিশ প্রধানদের অত্যন্ত সতর্কবান হতে হবে। যদি কেউ কোন অসৎ কাজে লিপ্ত হয় তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে যেন ক্রমান্বয়ে তারা সৎ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে। হাঁ, আর একটি কথা, দেশ

থেকে যতক্ষণ ঘুষ প্রথা দূর না হয় ততক্ষণ দেশের উন্নতি সাধন হবে না।”
মিঃ হেলালী মনে মনে শপথ গ্রহণ করলেন, বনহুরের কথাগুলো মেনে চলবেন এবং সেই মত পুলিশ মহলকে সতর্ক করে দেবেন যেন পুলিশ মহলে কোন দুষ্কৃতিকারী গজিয়ে উঠতে না পারে। কিন্তু দস্যু বনহুর কি করে গ্রেপ্তার হলো তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না। তিনি প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না, কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে দেখলেন কান্দাই হেড পুলিশ অফিসের লৌহ কারা কক্ষে বন্দী দস্যু বনহুরকে তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। মনটা দমেও গিয়েছিলো, ঐ মুহূর্তে কারণ তিনি যা বিশ্বাস করতে পারেননি তাই যেন ঘটে গেছে।

মিঃ হেলালী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন গত রাতের কথাগুলো, দস্যু বনহুরকে যখন কান্দাই হেড পুলিশ অফিসের লৌহ কারা কক্ষ থেকে হাঙ্গেরী কারাগারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মিলিটারী ভ্যানে উঠানো হচ্ছিলো তখন দস্যু বনহুরের দৃষ্টি একবার এসেছিলো তার দিকে, আশ্চর্য তাকে দেখে কোন রকম ভাবের সঞ্চার হলো না তার চোখে মুখে। মিঃ হেলালী অবশ্য এতে অবাক হন নি কারণ তিনি জানেন দস্যু বনহুর বুদ্ধিমান সে কিছুতেই নিজের মনোভাবকে প্রকাশ পেতে দেবে না। সে জন্যই হয়তো দস্যু বনহুর তার দিকে ফিরে তাকালো না। যদি কোন রকম ভাব ফুটে উঠে তার মুখ মন্ডলে। যদি অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ কিছু মনে করে বসেন।

......মিঃ হেলালীর চিন্তার বিরাম নাই।

❑

হুসনা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে। রাত বেশি না হলেও দশটার কম নয়। তবু চোখে ঘুম লাগছে না। একটা দুঃচিন্তার ছায়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটি মুখ বারবার ভেসে উঠছে তার চোখের সম্মুখে। মিঃ চৌধুরীই দস্যু বনহুর, তিনি আজ বন্দী, শুধু বন্দীই নয় হাঙ্গেরী কারাগারে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। হয়তো তার মৃত্যুদন্ড হবে আর কোন দিন

দেখা হবেনা তার সঙ্গে...কথাটা ভাবতেই হুসনার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে।

এমন সময় মিসেস আহসান কন্যার কক্ষে প্রবেশ করে বলেন —হুসনা মা ঘুমিয়েছিস?

হুসনা মায়ের পদ শব্দ পেয়ে দু'চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে পড়েছিলো, মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে সে পারলোনা, বললো ...আম্মা আমায় ডাকছো?

মিসেস আহসান কন্যার শয্যার পাশে এসে বসে বললো—এখনও ঘুমাও নি হুসনা?

না মা, চোখে ঘুম আসছে না।

আমিও ঘুমাতে পারছি না। জানিস হুসনা কাল তোর আব্বার জন্ম দিন। ঐ দিনে তোর আব্বা প্রতি বার আমাকে মূল্যবান কোন একটা জিনিস উপহার দিতেন। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন মিসেস আহসান।

হুসনা বললো—আমি জানি আব্বা ঐ দিন তোমাকে কিছু না কিছু দিতেন । তিনি ঐ দিন তোমার মুখে হাসি দেখতে ভাল বাসতেন। আম্মি আমি তোমাকে বলেছিলাম না একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি, তোমায় বলবো। আজ তোমাকে বলি কেমন শুনবে?

শুনবো, বল মা বল?

আমি স্বপ্নে দেখেছি আব্বা বেঁচে আছেন, আবার ফিরে আসবেন।

সত্যিই, তোর স্বপ্ন যেন সত্যি হয় মা।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হলো। পরক্ষণেই দারোয়ানের কণ্ঠস্বর—আম্মা সাহেব এসেছেন! সাহেব এসেছেন...

এক সঙ্গে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়ালো হুসনা আর মিসেস আহসান। বেরিয়ে এলো তারা বাইরে।

ততক্ষনে অন্তপুরে প্রবেশ করেছেন মিঃ আহসান।

প্রথমে যেন মিসেস আহসান বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না নিজেদের চোখকে। সত্যিই কি মিঃ আহসান ফিরে এসেছেন তাহলে।

আহসান সাহেব আনন্দে কেঁদে ফেলেন। কন্যাকে বুকে আকঁড়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—ভাল ছিলে মা হুসনা?

হুসনাও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—হাঁ, ভালছিলাম আব্বা। চলো ঘরে চলো।

আহসান সাহেব কন্যা স্ত্রী সহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন।

হুসনা পিতার মুখে তাকিয়ে দেখলো পূর্বের চেয়ে পিতার স্বাস্থ্য আরও ভাল এবং বলিষ্ঠ হয়েছে। আরও ফর্সা হয়েছেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস আহসান—ওগো এতো দিন তুমি কোথায় ছিলে? কেনো আসোনি? বাড়ির কথা কি মনে ছিলো না তোমার?

অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন মিঃ আহসান সাহেব তিনি বললেন—কোথায় ছিলাম আমি নিজেও জানিনা। কেনো আসিনি বুঝতেই পারছো আসার কোন উপায় ছিলোনা। আর বাড়ির কথা মনে ছিলো কিনা তা তোমাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে পারবোনা। অহঃরহ বাড়ির কথা মনে পড়েছে কিন্তু করবার কিছু ছিলোনা। তবে তোমাদের সংবাদ সব সময় পেয়েছি।

আব্বা সত্যি বলছো? জিজ্ঞাসা করে বসলো হুসনা।

মিঃ আহসান বললেন—হাঁ মা সত্যি তোমরা কেমন আছো এবং তোমরা আমার জন্য কি ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে সব খবর আমি পেয়েছি।

হুসনা বললো—জানি কে তোমায় এ সংবাদ দিতো।

জানিস! জানিস মা?

হাঁ আব্বা। মিঃ চৌধুরীর মুখে আমি সব শুনেছি!

সত্যি মা, দস্যু হলেও সে একজন মহৎ ব্যক্তি তাতে কোন ভুল নেই। আমি ঘৃণা করতাম কিন্তু আজ তাকে সমিহ করি।

আব্বা!

হাঁ মা, কিন্তু বড় আফসোস আজ সে বন্দী...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মিঃ আহসানের গলা।

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে রাত ভোর হয়ে আসে।

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে প্রখ্যাত পুলিশ গোয়েন্দা মিঃ আহসান ফিরে এসেছেন। পুলিশ মহলের সবাই দেখা করতে আসেন তার সঙ্গে।

সবাই অনুমানে বুঝে নিলেন দস্যু বনহুর তাকে বন্দী করে রেখেছিলো এবার বনহুর নিজে বন্দী হওয়ায় মিঃ আহসান সাহেব পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

মিঃ আহসান স্ত্রী কন্যার কাছে যা বললেন ততখানি খোলাসা আর কারো কাছে বললেন না। শুধু তিনি জানালেন দস্যু বনহুর তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গিয়েছিলো এবং আটক করে রেখেছিলো কোন এক গোপন কারাকক্ষে। তাকে যে ভাবে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো পুনরায় সেই ভাবে রেখে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে থেকে আসার সময় তিনি দস্যু বনহুরকে দেখেন নি বলে জানালেন। তিনি আরোও জানালেন কে বা কারা তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেছে তিনি ঠিক বলতে পারেন না। কারণ তার চোখ সব সময় কালো কাপড়ে বাঁধা ছিলো।

মিঃ আহসানের কাছে বেশি কিছু জানতে পারলেন না পুলিশ কর্মকর্তাগণ, কাজেই তারা কোন সঠিক হদিস খুঁজে পেলেন না। মিঃ আহসান ইচ্ছা করেই কতটা গোপন করে গেলেন!

হুসনা কিন্তু পিতাকে ধরে বসলো, সব কথা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে।

মিঃ আহসান না বলে পারলেন না।

সেদিন দোতালার ছাদে বসে সিগারেট পান করছিলেন মিঃ আহসান ঐ সময় হুসনা এসে পিতার পাশে দাঁড়ায়ে—আব্বা আজকে তোমার শরীর কেমন আছে?

ভালই আছি মা।

হুসনা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। দু'চোখে তার উৎসুক ভাব ফুটে উঠেছে।

মিঃ আহসান সিগারেট থেকে কয়েক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বলতে শুরু করলেন—আমি সেদিন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য মিঃ ফিরোজ রিজভীর বাড়ির অদূরে আমার সঙ্গীদের নিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিলাম। অন্যান্য পুলিশ অফিসার পুলিশ বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অন্যান্য দিকে।

রাত বেড়ে আসছে।

চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

আকাশে তারাগুলো জোনাকীর মত পিট পিট করে জ্বলছে।

ফিরোজ রিজভীর অদূরে কোন গির্জা থেকে ঘন্টা ধ্বনি হলো, আমি তখন সামান্য বিশ্রামের আশায় গির্জাভিমুখে রওয়ানা দিলাম কারণ খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ আমার দু'পাশ থেকে দু'জন লোক আমাকে ধরে ফেললো; সঙ্গে সঙ্গে আমার নাকে ওরা রুমাল চেপে ধরেছে বলে মনে হলো আমার। তারপর ওরা আমাকে একটা গাড়িতে তুলে নিলো বলে মনে হলো, এরপর আর আমার কিছু মনে নেই।

তারপর যখন জ্ঞান হলো দেখি সুন্দর একটি বিছানায় শুয়ে আমি, কিন্তু কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি, স্মরণ হচ্ছে পূর্বের ঘটনাগুলো। কেমন যেন সব এলো মেলো লাগছে। মাথাটা তখনও ঝিম ঝিম করছিলো।

ভাবছি আমি কোথায়, ঠিক ঐ সময় একজন লোক এসে বললো—উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিন।

আমি লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটা কোন শ্রমিক হবে। শরীরে শ্রমিকের পোশাক। আমি ওর কথায় উঠে বসলাম, তারপর বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়ে কোনদিকে যাবো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটা আমাকে পথের নির্দেশ দিলো। আমি সেই পথে কিছুটা এগুতেই দেখলাম একটি অদ্ভুত স্নানাগার। আমি সেই স্নানাগারে ইচ্ছামত স্নান করে নিলাম। তারপর দেখতে পেলাম এক পাশে নানা ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ থরে থরে সাজানো, আমি ইচ্ছামত আমার পরিধান উপযোগী জামা কাপড় পরে নিলাম।

বেরিয়ে আসতেই দেখলাম লোকটা স্নানাগারের বাইরে আমার জন্য প্রতিক্ষা করছে। আমাকে বললো, আসুন আমার সঙ্গে। আমি অনুসরণ করলাম। পুনরায় একটি কক্ষে আমাকে নিয়ে লোকটা প্রবেশ করলো। আমি দেখলাম কক্ষ মধ্যে একটি গোলাকার টেবিলে বহু রকম খাবার সাজানো রয়েছে। ক্ষুধায় পেটটা আমার চোঁ চোঁ করছিলো। আমি প্রতিক্ষা করছিলাম লোকটা আমাকে খাবার জন্য বলে কিনা।

হুসনা বলে উঠলো—আব্বা তুমি তো মোটেই খিদে সহ্য করতে পারোনা।

হাঁ মা, তাই-তো সব ভুলে খিদেটা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। লোকটা আমাকে খাবার জন্য অনুরোধ করলো। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেলাম।

খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত কোনদিকে তাকিয়ে দেখলাম না। পেটপুরে খেলাম তারপর ফিরে গেলাম বিশ্রাম কক্ষে দুগ্ধ ফেনিল শুভ্র বিছানা, সত্যি মা তোকে কি বলবো, খুব আরামে ঘুমালাম।

একদম জামাই আদরে ছিলে তাহলে?

ঠিক বলেছিস মা,. জামাই আদর কাকে বলে।

বুঝেছি সে জন্যই আমাদের কথা ভুলে গিয়েছিলে?

তা-নয় মা তা-নয় তোদের কথা কোন সময় ভুলিনি, বাধ্য হয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য নাওয়া খাওয়া করেছি।

বেশ করেছো আব্বা না হলে আজ তোমাকে আমরা ফিরে পেতাম না। তারপর কি হলো বলো না?

হাঁ বলছি, জানি না রাত না দিন কিছু বুঝতে পারতাম না কারণ আমাকে যেখানে আটক করে রাখা হয়েছিলো সেটা ছিলো মাটির তলায়। বন্দী অবস্থায় হলেও আমার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাকে সংবাদপত্রও পড়তে দেওয়া হয়েছে। এমন কি দাঁড়ি ছাট্‌বার জন্য ছোট কাঁচি এবং সেভের জন্য সরঞ্জামও দেওয়া হয়েছে।

আব্বা তুমি এত সুবিধায় ছিলে জানলে আমরা তোমার জন্য এতো ভাবতাম না। সত্যি আমরা সবাই তোমার জন্য খুব অশান্তিতে ছিলাম।

তোমাদের সব কথা সংবাদ পত্রে জানতে পারতাম। কিন্তু করবার কোন উপায় ছিলো না। বুঝতে পারতাম না কে বা কারা আমাকে এ ভাবে আটক রেখেছে। আর আমাকে আটকে রেখে কিইবা লাভ তাদের এটাও আমি বুঝতে পারিনি। বুঝলাম দু'সপ্তাহ পর।

হুসনা এবার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—কি বুঝতে পারলে আব্বা?

আমি শুয়ে শুয়ে সংবাদপত্র পড়ছিলাম যেমন অন্যান্য দিন পড়ি। এমন সময় সেই লোকটা যে প্রথম থেকেই আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো সে এসে জানালো—চলুন আপনাকে সর্দার ডাকছেন।

আমি চমকে উঠলাম—সর্দার! কে তোমার সর্দার?

লোকটা বললো—চলুন সাক্ষাতে দেখবেন।

সংবাদপত্র রেখে উঠে পড়লাম।

লোকটা চললো, আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি। বেশ কিছুটা চলার পর একটা লিফ্টের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সে। একটা সুইচে চাপ দিতেই—লিফটের দরজা খুলে গেলো, সে আমাকে লিফটে উঠে দাঁড়াতে বললো। আমি লিফটে উঠতেই সেও উঠে দাঁড়ালো; লিফট এবার সাঁ সাঁ করে উপরে উঠতে লাগলো। মাত্র কয়েক মিনিট, লিফট থেমে গেলো। সে নামলো আমাকেও নামার জন্য বললো। আমি নামতেই পুনরায় সে এগুলো। আমি তাকে অনুসরণ করে একটা কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেই চমকে উঠলাম কারণ দেখলাম জমকালো পোশাক পরা একটি লোক কক্ষ মধ্যে পায়চারী করছে।

আমার সঙ্গী তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। আমি স্থির ভাবে তাকালাম তার দিকে। লোকটির মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচলে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। আমরা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই জমকালো পোশাক পরা লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে তাকালো আমার দিকে,

পা থেকে আমার মাথা অবধি দেখে নিয়ে আমার সংগী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো—রহমান তাহলে ঠিক ভাবেই কাজ করেছো, ভুল করো নি কোন।

আমার সঙ্গীটি জবাব দিলো—হাঁ সর্দার, রহমান লোক চিনতে ভুল করে নি।

এবার জমকালো মূর্তি মুখের কালো আবরণ সরিয়ে ফেললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—মিঃ চৌধুরী?

জমকালো মূর্তি—জবাব দিলো—না দস্যু বনহুর।

আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—তুমি-তুমি তাহলে আমাকে বন্দী করে এনেছো?

দস্যু বনহুর বললো—ঠিক্ আমি নই আমার নির্দেশে আমারই সহচর আপনাকে নিয়ে এসেছে। তবে আপনি বন্দী নন আটক বলতে পারেন। কোন কারণ বশতঃ আপনাকে কিছুদিন আমি আটকে রাখতে চাই।

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে আব্বা? বললো হুসনা।

মিঃ আহসান বললেন—আমি তখন রাগে ক্ষোভে কোন জবাব দেইনি। দস্যু বনহুর আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললো—মিঃ আহসান আপনার কন্যার জীবনের বিনিময়ে আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যা চাইবেন তাই দেবেন।

আমি তখনও কোন জবাব দিলামনা।

বনহুর বললো আবার—জানি, আপনি আপনার কথা রাখতে ইচ্ছুক নন কিন্তু মনে রাখবেন যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের আমি ক্ষমা করিনা আর ক্ষমা করিনা যারা কথা দিয়ে কথা না রাখে। আপনি জানতেও চাইলেননা আমি কি চাই?

তখন কথা না বলে পারলামনা, বললাম—বলো তুমি কি চাও?

বনহুর বললো—হাঁ, এবার ঠিক্ মানুষের মত কথা বলেছেন। শুনুন মিঃ আহসান, হুসনার বাবা বলে আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করি কারণ আপনি আমারও বাপের মত। কিন্তু আপনাকে আমি বারবার বলেছিলাম আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাবেন না। আপনি আমার কথা রাখেননি আমি

সে জন্য দুঃখিত। মিঃ আহসান এ কারণেই আমি আপনাকে আটকে রাখবো এবং আপনার ছদ্মবেশে আমি কিছু কাজ করবো। আমি চাই আপনার সহযোগীতা। বলুন পারবেন? দেবেন আমি যা চাই?

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে আব্বা?

বলেছিলাম—বেশ আমি দেবো। আমার সহযোগীতা পাবে।

বেশ তা হলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। তারপর সে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেই কক্ষ থেকে।

আমি ফিরে এসেছিলাম আমার কক্ষে।

এরপর আর ওর সংগে তোমার দেখা হয়নি আব্বা।

না মা আর তার সংগে দেখা হয়নি।

তোমাকে কে এখানে পৌঁছে দিলো তাও জানোনা?

ঠিক্ জানিনা বললে মিথ্যা বলা হবে তবে এটুকু জানি দস্যু বনহুরেরই কোন বিশ্বস্ত অনুচর আমাকে এখানে রেখে গেছে। জানিস মা ওখানে কত সুখে ছিলাম কত আরামে ছিলাম, ওরা কোন সময় আমার সংগে অসৎ ব্যবহার করেনি।

আব্বা তুমিও কোনদিন ভুল করোনা তোমার শপথের কথা।

কিন্তু তার আগেই যে সে হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী হবে কে জানতো মিঃ আহসান একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন!

❑

কান্তা বার।

কান্দাই শহরের নামকরা চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, এই কান্তা বার। শহরের ধনবান এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিগণই এই বারে আসেন। তারা ইচ্ছা মত আমোদ প্রমোদ করেন তারপর ফিরে যান যে যার বাস ভবনে। কান্তা বার এর প্রধান আকর্ষণ হলো দিপালী নামে একটি তরুণী নর্তকী।

দিপালীর জন্ম কাশ্মীরে।

প্রথমে ওর নাম ছিল মেরিনা পরে ওর নাম হয় দিপালী।

কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁ দেওয়ানী।

বয়স তার পঞ্চাশের বেশি।

এককালে সে কাশ্মীর ব্যবসা করতো।

হিম্মৎ খাঁ যখন কাশ্মীর ত্যাগ করে চলে আসে তখন তার সংগে ছিলো একটি ছোট মেয়ে নাম তার জেরিনা। আর ছিলো কিছু সোনাদানা।

কান্দাই এসে ছোট একটা হোটেল খুলে বসেছিলো হিম্মৎ খাঁ। মেয়েটাকে নিয়ে বেশ চলছিলো তার! সোনাদানা গোপনে বিক্রি করতো আর হোটেল জেকে বসে থাকতো।

একদিন সেই হিম্মৎ খাঁ কান্তা বার নামে একটি চিত্তবিনোদন কেন্দ্র খুলে বসলো।

তখন দিপালী তরুণী।

লাব্যণ্যময়ী দিপালীর রূপে কান্তাবাবু যেন অপরূপ হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত কান্তা বারে চিত্তমোদিদের ভীড় জমে উঠে। সুরা পান ছাড়াও নাচ গান চলে কান্তা বারে।

নাচনে ওয়ালী দিপালী চান সবাইকে মুগ্ধ করে বিস্মিত করে হতবাক করে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব হতেই মুষল ধারে বৃষ্টি নামলো সমস্ত শহরে নেমে এলো এক জমাট নীরবতা।

কান্তাবারের সম্মুখে এসে থামলো একটা গাড়ি। নতুন ঝক ঝকে মডেল কার। কার থেকে নামলেন মিঃ হেলালী। তরুণ পুলিশ সুপারকে একা কান্তাবারে প্রবেশ করতে দেখে অনেকেই অবাক হলেন।

যারা পরিচিত তারা অভিনন্দন জানালো মিঃ হেলালীকে।

মিঃ হেলালীর শরীরে পুলিশের পরিচিত পোশাক নয় সাধারণ স্বাভাবিক মূল্যবান কোট প্যান্ট টাই। বগলে একটা ছোট হান্টার।

বারের অভ্যর্থনাকারী মিঃ হেলালীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলো। ঠিক্ ঐ মুহূর্তে দক্ষিণ পাশের টেবিলে বসা চার জন লোক একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো নিজেদের মধ্যে। মিঃ হেলালীকে দেখে তারা ভীষণ ভাবে আশ্চর্য না হলেও কিছুটা বিস্মিত না হয়ে পারলোনা। কারণ কান্তাবারে পুলিশ সুপার মিঃ হেলালী, বিস্মিত হবার কথাই বটে।

যারা কান্তাবারের দক্ষিণ দিকের আসনে বসেছিলো তারা হলো হিরু বন্দরের অধিবাসী মিঃ ফিরোজ রিজভীর সঙ্গে ছিলো এদের কারবার। হিরু বন্দরে এদের বেশ কয়েকটা জাহাজ রয়েছে৷ এই সব জাহাজে কান্দাই থেকে গোপনে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই করে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। ফিরোজ রিজভী এবং তার সহকারীদের নিহত সংবাদে এরা শুধু মর্মাহত হয়নি এদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলতো তাদের রিজভীর সঙ্গে।

এদের নেতার নাম হলো মোসলে উদ্দিন সিরাজী। তার সঙ্গীদের নাম হুমাইয়া, জারু, মহিস উদ্দিন, ফারুক হোসেন। এরা সবাই এসে কান্দাই জড়ো হয়েছে। এদের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের চোরা চালানী কারবার বাঁচিয়ে রাখা। কারবারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শহরের কিছু সংখ্যক স্বনামধন্য ব্যক্তিদের হাত করতে হবে এবং হাত করতে হবে পুলিশের কর্মকর্তাদের।

মিঃ হেলালীকে এরা চিনতো না কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে শহরে এসেই সর্বপ্রথম পুলিশ কর্মকর্তাদের চিনে নিয়েছেন কোন কৌশলে। তাই আজ মিঃ হেলালীকে চিনতে তাদের মোটেই কষ্ট হয়না। একবার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো তারপর উঠে দাঁড়ালো ওরা।

মিঃ হেলালী তখন বারের মধ্যভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

দিপালী তাঁকে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অভিনন্দন জানায়। মিঃ হেলালী বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে সত্যি তরুণী সুন্দরী বটে।

ডাগর ডাগর দু'টো চোখ মেলে বলে দিপালী—বাবু কি দেখছো?

মিঃ হেলালী হেসে বলে—তোমাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠে দিপালী—আমি একটা সামান্য নর্তকী। আমাকে তুমি এমন করে দেখছো কেনো বাবু?

না কিছু না চলো।

দিপালী বলে—এসো বাবু।

মিঃ হেলালী এগিয়ে চলেন ওর সঙ্গে।

সুসজ্জিত একটি কক্ষ মধ্যে এসে দাঁড়ালো দিপালী। অপরূপ দেহ ভঙ্গীমায় বললো—বসো।

মিঃ হেলালী বসলেন।

দিপালী ওপাশ থেকে এক বোতল সরাব আর একটি কাঁচ পাত্র এনে রাখলো সম্মুখস্থ টেবিলে। তারপর কাঁচ পাত্রে সরাব ঢেলে বাড়িয়ে ধরলো—নাও।

মিঃ হেলালী কোনদিন সরাব স্পর্শ করে নাই তিনি একটু হক চকিয়ে যান। বলেন—না আমি ওসব খাই না।

দিপালী খিল খিল করে হেসে উঠে—তবে কেনো এসেছো বাবু?

মিঃ হেলালী মৃদু হেসে বললেন—তোমার নাচ দেখতে।

ততক্ষণে মোসলে উদ্দিন সিরাজী তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে বসলো কক্ষ মধ্যে অন্যান্য চেয়ারগুলো দখল করে নিয়ে। তারা আসন গ্রহণ করতেই তাদের সম্মুখে কয়েক বোতল সরাব আর কয়েকটা কাঁচ পাত্র রেখে গেলো একটি বয়।

ওরা সরাব পান করতে করতে বার বার বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন মিঃ হেলালীকে।

দিপালী তার নুপুরে ঝঙ্কার তুলে নাচতে শুরু করলো।

অপরূপ দেহ ভঙ্গীমায় মুগ্ধ হলেন মিঃ হেলালী তিনি এখানে এসেছেন গোপনে সন্ধান নিতে, কারণ মিঃ হেলালী জানতে পেরেছেন কান্তাবারের অভ্যন্তরে চলে নানা রকম অসৎ কর্ম। এখানেই নাকি দুষ্কৃতিকারীদের উৎস।

মিঃ হেলালীর দৃষ্টি দিপালীর দিকে থাকলেও তার লক্ষ্য ছিলো কান্তাবারের চারিদিকে। কোথায় কে কি করছে সব তিনি দেখছিলেন।

মিঃ হেলালী যখন দিপালীর সঙ্গে কান্তা বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিলেন তখন দক্ষিণ পাশের লোকগুরো যে তাকে লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো সেটুকু মিঃ হেলালীর চোখে বাদ যায়নি। তারপর মিঃ হেলালী যখন কক্ষ মধ্যে এসে বসলেন তখন ঐ লোকগুলো যে সেই কক্ষে এসে বসলো তাও তিনি দেখলেন। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দিপালী তখনও নেচে চলেছে।

দিপালীর নুপুর ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে কান্তা বার। আরও অনেক ধনকুবেরু এসে জমায়েত হয়েছে, বিভিন্ন টেবিলের চার পাশ ঘিরে বসেছে সবাই। বয় যার যা প্রয়োজন মত পানিয় পরিবেশন করে চলেছে।

মিঃ হেলালীর সম্মুখে দিপালী হাটু গেড়ে বসে পড়ে, তারপর দু'হাত প্রসারিত করে ধরতে যায় ওর গলা—কিন্তু মিঃ হেলালী দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। দিপালীর নাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো সে কিছু ইংগিৎ করে।

মিঃ হেলালী ঠিক বুঝতে পারেন না।

দিপালী চলে যায় একটু পরে ফিরে আসে। আবার সে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। অদ্ভুত সে নৃত্য ভঙ্গীমা।

নাচতে নাচতে সবার সম্মুখে একটিবার ঝুকে পড়ে সে। এবার দীপালী এসে দাঁড়ায় মিঃ হেলালীর সম্মুখে, অতি সতর্কতার সঙ্গে এক টুকরা কাগজ গুঁজে দেয় সে মিঃ হেলালীর হাতের মুঠায়।

মিঃ হেলালী চমকে উঠলেও নিজকে সংযত করে নেয় সঙ্গে সঙ্গে! পুনরায় আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবার টেবিলের আড়ালে কাগজের টুকরাটা নিয়ে এক নজর দেখে নিলেন। কাগজের টুকরায় লিখা আছে—

কান্তা বার আপনার জন্য নয়। আপনি
এক্ষুণি চলে যান নাইলে বিপদ আসন্ন।

—দিপালী

মিঃ হেলালী চিঠিখানা পড়ে মৃদু হাসলেন তারপর নতুনভাবে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

দিপালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো মিঃ হেলালীর মুখের দিকে। এক মুখ ধোয়া তিনি ছুড়ে দিয়ে বললেন—তোমার নাম কি সুন্দরী?

দিপালী। বললো নর্তকী।

বড় সুন্দর নাম।

দিপালীর সঙ্গে যখন মিঃ হেলালী কথা বলছিলেন তখন মোসলে উদ্দিন সিরাজী বেরিয়ে গেলো সবার অলক্ষে যাবার সময় ইঙ্গিৎ করলো সে তার সহকর্মীদের।

দিপালী কিন্তু লক্ষ্য করেছিলো মোসেল উদ্দিনের শয়তানী ভাবসাবটাকে। সে বললেন—না চলে যাবো না সুন্দরী। চলো তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

কিন্তু......

না কোন কিন্তু নয় চলো। ভিতরে চলো দিপালী।

দিপালীর মুখমণ্ডল কেমন যেন ভয় বিহ্বল মনে হলো তবু সে চললো।

মিঃ হেলালীর মূল উদ্দেশ্য কান্তাবারের সব কিছু তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন।

সেই কক্ষ ত্যাগ করে দিপালী অপর এক কক্ষে এসে পৌছলো। চারদিক দেখে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো—জানিনা আপনি কে। আমি চিনিনা কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে কান্তা বার আপনার জন্য নয়।

আমি জানি, তবু কেনো এসেছি জানো? তোমার সহায়তা পাবো বলে। দিপালী তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

করবো! কিন্তু এখানে আপনি নিরাপদ নন।

জানি।

হাঁ তবু? চলো দিপালী তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে কান্তা বারের সম্মুখে এসে থামলো আর একটি গাড়ি। অদ্ভূত সে গাড়ি খানা, গাড়ির কোন দরজা নাই। ড্রাইভিং আসনের পাশ দিয়ে একটি মাত্র দরজা।

দিপালী বললো—আসুন তবে।

কিন্তু দিপালী পা বাড়ানোর পূর্ব দণ্ডে মিঃ হেলালীর দু'পাশে দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে দাঁড়ালো—তাদের হাতে উদ্যত রিভলভার।

মিঃ হেলালী হঠাৎ চমকে উঠলেন না তিনি তাকিয়ে একবার দেখে নিলেন, পর মুহূর্তেই পকেট থেকে বের করলেন একটা পিস্তল।

পাশের লোক দু'জনের মধ্যে একজন কৌশলে মিঃ হেলালীর হাতে আঘাত করলো।

মিঃ হেলালীর হাত থেকে পিস্তলটা ছিট্‌কে পড়লো দূরে। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হেলালী ঝাপিয়ে পড়লো দুস্কৃতিকারীদের উপর।

শুরু হলো তুমুল লড়াই।

ওরা দু'জন মিঃ হেলালী একা।

দিপালী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, সে নিরুপায়ের মত তাকাতে লাগলো এদিক সেদিক।

ততক্ষণে মিঃ হেলালীকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন গুণ্ডা লোক।

মিঃ হেলালী উঠে দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে ফু দিলেন। তৎক্ষণাত একদল সশস্ত্র পুলিশ প্রবেশ করলো কান্তা বারের অভ্যন্তরে।

কিন্তু তখন মিঃ হেলালীকে ওরা সরিয়ে নিয়েছে। পুলিশ বাহিনী কান্তা বারে প্রবেশ করে মিঃ হেলালীকে খুঁজে পেলোনা।

তখন মিঃ হেলালীর নাকে রুমাল ধরে সরিয়ে ফেলেছে মোসলে উদ্দিনের লোক। একটা লিফ্‌ট নেমে গেছে নিচের দিকে। কান্তা বারের অতল গহ্বরে।

লিফটে সংজ্ঞাহীন মিঃ হেলালীকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বলিষ্ঠ দু'জন লোক।

মোসলে উদ্দিন ও তার অন্যান্য লোকজন সবাই যার যার টেবিলে এসে বসেছে। সবাই সুরা পানে ব্যস্ত হাসি গল্প করছে যেন আপন মনে। একটু পূর্বে এখানে কিছু একটা ঘটে গেছে এমন কিছু বুঝবার জো নাই।

পুলিশ ফোর্স কান্তা বারে প্রবেশ করে এদিক ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দিলো কিন্তু তাদের চোখে এমন কিছু দোষণীয় ব্যাপার ধরা পড়লোনা। সবাই সন্ধান করছে মিঃ হেলালীর।

হিম্মৎ খাঁ বসেছিলো তার বিশ্রামাগারে একজন লোক গিয়ে তার কানে কানে কিছু বললো সঙ্গে সঙ্গে হিম্মৎ খাঁ নেমে এলো নিচে। দিপালী এক পাশে দাঁড়িয়েছিলো।

হিম্মত খাঁ তাকে কিছু ইশারা করলো।

দিপালী অমনি নাচতে শুরু করে দিলো।

যারা বারের অভ্যন্তরে বসে সুরা পানে মত্ত ছিলো দিপালী তাদের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে নাচ পরিবেশন করে চললো। পুলিশ বাহিনী তখন সন্ধান করে ফিরছে কোথায় গেলো মিঃ হেলালী।

অনেক খোঁজাখুজি করেও যখন পুলিশ বাহিনী মিঃ হেলালীর কোন খোঁজ পেলেন না তখন তারা বিফল মনোরথে ফিরে চললো।

মোসলে উদ্দিন এবং হিম্মত খাঁ একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলো।

দিপালীর চোখ এড়ালোনা এ দৃশ্য। সে সব জানে কান্তা বারের অভ্যন্তরে সব কাহিনী সে জানে। কত শত শত মহৎ ব্যক্তিকে এই কান্তা বার সর্ব শান্ত করে দিয়েছে। কত লোকের বুকের রক্ত আজও কান্তা বারের কোন এক গোপন কক্ষে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। দিপালী এর কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা কারণ তারই পিতা এই কান্তা বারের মালিক এবং তারই দ্বারা এ সব কুকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কান্দাই এর বহু সোনা দানা আর মূল্যবান সামগ্রী চোরা চালানী হয়ে চলে যাচ্ছে এদেশ থেকে দূরে বহু দূরে। শুধু তাই নয় প্রচুর খাদ্যশস্যও গোপনে চালান হচ্ছে এই কান্তাবারের সহযোগীতায়। কান্তা বার হলো চোরাচালানী আর দুষ্কৃতিকারীদের আড্ডা স্থল।

দিপালী সব দেখে সব বুঝে তবু বলবার কিছু নেই, যদিও ওর মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। সে বড় হবার পর থেকে হিম্মত খাঁকেই পিতা বলে চিনেছে কাজেই পিতার বিরুদ্ধাচরণ করা ওর বিবেকে বাধে।

নীরবে সব দেখে যায় দিপালী।

মন যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠে তখন কান্তা বারের তিন তলার ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেয় সে। অসংখ্য তারার প্রদীপ তাকে হাত ছাড়ি দিয়ে ডাকে, এসোত দিপালী, তুমিও এসো আমাদের পাশে। দিপালীর মন চায় ঐ অসংখ্য তারার পাশে গিয়ে সেও জ্বলবে। পৃথিবীর মানুষ তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু স্পর্শ করতে পারবেনা।

দিপালীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু। কোথায় যেন তার ব্যথা, কিসের যেন অভাব নিজেই তা বুঝতে পারেনা। ছোট থেকে এই বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আজও সে একটি দিনের জন্য তৃপ্তি বা শান্তি পায়নি।

হিম্মৎ খাঁর আদর যত্ন তাকে পিতার নিবিড় স্নেহ দিতে পারেনি কোথায় কিসের যেন অভাব সদা সর্বদা তার মনকে বিষণ্ন করে রেখেছে।

হিম্মৎ খাঁ দিপালীকে তার বারের প্রধান অলংকার মনে করে আদর যত্নের কোন ত্রুটি করে নাই তবু দিপালী নিজকে অসহায় মনে করতো। প্রতিদিন নিত্য নতুন মানুষের মন তুষ্ট করার জন্য তাকে নানা ভাবে প্রস্তুতি নিতে হতো। এ সব শিক্ষা লাভ করেছে সে-হিম্মৎ খাঁর কাছ থেকে।

মাঝে মাঝে মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজে পায় নি। কোথায় যাবে সে, কে দেবে তাকে আশ্রয়। যদি এখন থেকে পালিয়ে সে চলে যায়, সেখানেও যদি তার ভাগ্য তাকে অনুসরণ করে। তাই দিপালী পালাতে পারে নি।

দিপালী জানে শহরের কারা দুস্কৃতিকারী। কারণ কান্তা বারেই যে দুস্কৃতিকারীদের মিলন ক্ষেত্র। দিপালী এদের সন্ধান জানে আরও জানে কারা কেমন লোক। কে কি কাজ করে তাও সে জানে। তারই সম্মুখে দুস্কৃতিকারীগণ তাদের গোপন আলোচনা চালায় দিপালী তখন না বোঝার মত ভান করে হয় সরাব পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকে নয় নৃত্য পরিবেশন করে চলে।

মিঃ হেলালীকে দিপালী চিনতে পারেনি কারণ তাকে কোন দিন দেখেনি কাজেই সে জানে না কে তিনি। কান্তা বারে নিত্য নতুন মুখের আমদানী হয়। মিঃ হেলালীকেও সে তেমনি একজন লোক মনে করেছিলো।

মিঃ হেলালী কান্তা বারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কান্তাবারের দক্ষিন দিকের আসনে বসা লোকগুলোর মুখোভাব দিপালীকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। দিপালী বুঝতে পেরেছিলো এই ব্যক্তি সামান্য কেউ নন নিশ্চয়ই এমন কোন এক লোক যাকে দেখে মোসলেম উদ্দিন ও তার দল বল চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো।

দিপালী তাই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো কান্তা বারের অভ্যন্তরে এবং নৃত্যের ছলনায় তাকে কান্তা বার ত্যাগ করবার জন্য বার বার ইংগিত করেছিলো।

মিঃ হেলালী দিপালীর ইংগিত বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করেছিলেন কারণ তিনি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা তাঁকে করতেই হবে। তিনি গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছিলেন কান্তাবারের অভ্যন্তরে চলেছে নানা রকম অসৎ কাজ এবং এখানেই তিনি সন্ধান পাবেন দুস্কৃতিকারীগণের। যারা দিনের পর দিন অসৎ উপায়ে চোরাকারবার চালিয়ে চলেছে। মিঃ হেলালী একা আসে নি এসেছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে। এদের তিনি কান্তা বারের বাহিরে আত্মগোপন করতে বলে নিজে ছদ্ম বেশে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন মিঃ হেলালী পুলিশ বাহিনীকে জানিয়ে রেখেছিলেন। ভিতরে যদি তেমন কিছু পরিলক্ষিত হয়, যদি তিনি দুস্কৃতিকারীদের সন্ধান পান তাহলে হুইসেলের শব্দ করলেই তারা যেন দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করে।

পুলিশ বাহিনী মিঃ হেলালীর কথা মত প্রস্তুত হয়েই ছিলো, হুইসেলের শব্দ শোনা মাত্র ভিতরে প্রবেশ করে এলোপাথারী খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী বিফল হলো। কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও মিঃ হেলালীর কোন সন্ধান তারা জানতে পারলোনা।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই পুলিশ মহলে ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ প্রধান জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়লেন।

মিঃ হেলালী অকস্মাৎ উধাও। তিনি কোথায় গেলেন কেউ বলতে পারে না।

মিঃ জায়েদী দল বল নিয়ে কান্তা বারে এসে হাজির হলেন। নানাভাবে খানা তল্লাশী চালিয়ে কোন রকম সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলেন না।

হিম্মৎ খাঁ পুলিশ কর্মকর্তাগণকে আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ করে দিলেন।

মিঃ হেলালী বা কোন পুলিশ অফিসার সেখানে গিয়েছে বলে তারা জানে না। এমন কি সেখানে গিয়ে মিঃ জায়েদীর সঙ্গে সরকার পক্ষের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ ঘটলো যারা এখন দেশ ও দশের মহান নেতা।

অবশ্য এই নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিদের আনাগোনা এখানে প্রকাশ্যে ছিলো না এরা গোপানে আসা যাওয়া করতো। মিঃ জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ অকস্মাৎ গিয়ে হাজির হওয়ায় তাদের সঙ্গে মোলাকাত হয়ে যায়। এতে মহামান্য অতিথিবৃন্দ লজ্জাবোধ না করে পুলিশ প্রধানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান।

মিঃ জায়েদী ও তার সহকর্মী পুলিশ অফিসারগণ দেশের মহান নেতাদের কান্তা বারে দেখে হক চকিয়ে না গেলেও নিজেরা একটু বিব্রত বোধ করেন এবং সেখান থেকে কেটে পড়ার চেষ্টা চালান।

মিঃ জায়েদীও বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা বা সন্ধান চালানো প্রয়োজন বোধ করলেন না কারণ দেশের সরকার পক্ষের লোকই এ কান্তা বারের খদ্দের জেনে তিনি কতকটা আস্বস্ত হলেন।

মিঃ জায়েদী দলবল সহ বিদায় নিতেই কান্দাই-এর খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের সহকারী মীর্জা মোহাম্মদ হাই তুলে বললেন—হিম্মৎ খাঁ দেখলেন।

হিম্মৎ খাঁ বললেন—হাঁ দেখলাম।

মীর্জা মোহম্মদ ব্যাঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললেন—যত সব অপদার্থ।

হিম্মৎ খাঁ সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো—স্যার নিন।

মীর্জা মোহম্মদ বার বার হাই তুলছিলেন কেনো না সরাবের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো। তিনি হলেন কিনা সরকার বাহাদুরের খাদ্য মন্ত্রীর প্রধান সহকর্মী মীর্জা মোহাম্মদ। তার সম্মান কম নয়, কান্দাই এর প্রায় গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করেন। হিম্মৎ খাঁ সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন—মিঃ হেলালীর সন্ধানে এসেছে কান্তা বারে। মিঃ হেলালী কি এখানে আসার যোগ্য মানুষ? তিনি হলেন কিনা একটা......থেমে গেলেন মীর্জা মোহম্মদ।

আর আর যারা তখন উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে যারা ছিলেন এদের নাম দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান, হাসান কাদেরী।

এরা সবাই মীর্জা মোহাম্মদকে সমীহ করে শ্রদ্ধা করে। কারণ খাদ্য বিভাগীয় প্রধানের প্রধান সহকর্মী হলেন তিনি। দেশ ও দশের ভবিষ্যৎ বলা চলে।

কান্দাই এর প্রেসিডেন্ট আবু গাওসার হলেন সত্যিকারের মহান এবং মহৎ ব্যক্তি তিনি চান দেশ ও দশের মঙ্গল কিন্তু তার দক্ষিণ ও বাম হস্ত যারা তারাই হলেন এই নেতৃস্থানীয় দল যারা অসৎ কর্মের শিরমণি। এরা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি সেজে অন্যায় অনাচার চালিয়ে চলেছে। দেশের দ্রব্য মূল্য অগ্নি সম হলেও এদের তেমন কিছু যায় আসেনা কারণ এদের তো আর পয়সার অভাব নেই। দেশের যারা অসৎ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কাজেই পয়সা আপনা আপনি এসে যায় হাতের মুঠায় ঠিক ভোজ বাজীর মত।

আজ মিঃ জায়েদীর সঙ্গে কান্তা বারে যাদের দেখা হলো তারা সবাই সম্মানিত জন কাজেই মিঃ জায়েদী বা তার দলবল চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মীর্জা মোহাম্মদের কথায় দেওয়ান রাব্বী বললেন—ঠিক্ বলেছেন স্যার মিঃ হেলালী হলেন একজন নিরস পুলিশ সুপার। কোনদিন তাকে কোন পার্টি বা ফাংশানে দেখা যায় না।

গোলাম সোবহান বললেন—তরুণ পুলিশ সুপার কিনা তাই নাম কেনার জন্য ব্যস্ত।

হাসান কাদেরী তার ফ্রেন্স কাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—যত সব হুজুবুদ্ধ এরা কি যে দেশের কাজ করবে একেবারে সব গোবরে গাধা। স্যার এরা দেশের কোন কাজে আসে না। যা করছি তা আমরাই......কথাগুলো শেষ করেই ঢক্ ঢক্ করে কিছুটা সরাব গলধঃকরণ করে নেয়।

মীর্জা মোহাম্মদ জড়িত কণ্ঠে বলেন—চলুন এবার উঠা যাক।

স্যার দিপালীর নাচ যে এখনও দেখা হয়নি? বললো দেওয়ান রাব্বী।

মীর্জা মোহাম্মদের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—তাই তো। —হিম্মৎ খাঁ?

বলুন মালিক? হিম্মৎ মিনতী ভরা কণ্ঠে বললো।

মীর্জা মোহম্মদ ইংগিত করলেন কিছু।

হিম্মৎ খাঁ হাতে তালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি বেয়ে নেমে এলো দিপালী।

হিম্মৎ খাঁ তাকে লক্ষ্য করে বললো—নাচো।

দিপালীর ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেলো। একবার সে ঐ মহামান্য অথিতিদের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর অনিচ্ছা সত্যেও নাচতে শুরু করলো।

এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো নতুন ঝক ঝকে টয়োটা কার। কার থেকে নামলো একটি যুবক, শরীরে মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ। যুবক কান্তা বারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

হিম্মৎ খাঁ শসব্যস্তে এগিয়ে এসে নত হয়ে অভিবাদন করলো—ইনি জাংহার রাজকুমার জ্যোতির্ময়।

মীর্জা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গী সাথীগণ স্বসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে এক এক করে করমর্দন করলেন।

মীর্জা মোহম্মদ বললো—সৌভাগ্য তাই আজ আপনার সংগে সাক্ষাৎ লাভ ঘটলো। এতোদিন শুধু আপনার নাম শুনে এসেছি-----

রাজকুমার জ্যোতির্ময় একটু হাসলো মাত্র।

দিপালী কিন্তু তখনও নেচে চলেছে।

নৃত্যের তালে জ্যোতির্ময়ের সম্মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো দিপালী। বিস্ময় ভরা চোখে সে দেখে নিলো ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তারপর পুনরায় সে নাচতে শুরু করলো—অপূর্ব সে নাচ।

জ্যোতির্ময় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দিপালীর দিকে। কোনদিন সে কান্তা বারে আসেনি এটাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

হিম্মৎ খাঁর দু'চোখে আনন্দের উৎস।

তারই নির্দেশ মত নানা রকম খাবারের সঙ্গে এলো মূল্যবান সরাবের বোতল।

মীর্জা মোহাম্মদ এবং তার সহচরগণও জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে মিশে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে উঠেলেন।

কুমার জ্যোতির্ময় কোনদিন সরাব পান করেনি সে অল্পক্ষণে নেশায় আত্নহারা হয়ে পড়লো। পকেট থেকে টাকার গাদা গাদা নোট বের করে টেবিলে ছুড়ে দিতে লাগলো।

হিম্মৎ খাঁ দু'হাতে নোটগুলো জড়ো করে নিয়ে পকেটে রাখতে লাগলো।

তার কান্তা বারে প্রতিদিন শতশত ধনকুবেরদের আনাগোনা হয়ে থাকে কিন্তু এমন অদ্ভুত লোক সে কোনদিন দেখেনি। এতো টাকা, দু'চোখে যেন সে সর্ষেফুল দেখছে। দিপালী এতোক্ষণ বোতল থেকে সরাব ঢেলে পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছিলো, তারও চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বিস্ময়ে।

মীর্জা মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীগণও হতবাক হয়ে গেছে।

❑

দুর্গম অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে দু'জন লোক মিঃ হেলালীর সংজ্ঞাহীন দেহটা বয়ে নিয়ে চলেছে। এরা দু'জন মোসলে উদ্দিনের লোক। অসীম শক্তিশালী এরা তাতে কোন সন্দেহ নাই। এদের এক জনের নাম জারু অপর জনের নাম ফারুক হোসেন।

এরা মিঃ হেলালীকে যখন বয়ে নিয়ে চলেছে তখন মোসলে উদ্দিন, হুমাইয়া ও মহিসাদ্দিন ফিরে আসে কান্তা বারে। কারণ তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলে বাইরে অদ্ভুত ধরণের দরজা বিহীন একটি গাড়ি। ঐ গাড়িতে চালান যাবে মূল্যবান সামগ্রী যা কান্দাই জনগণের রক্ত নিংরিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

হিম্মৎ খাঁর সহযোগীতায় মোসলে উদ্দিন এবার তার ব্যবসা জেকে বসেছে। শুধু মোসলে উদ্দিন নয় এমনি বহু চোরাকারবারী শহরের বিভিন্ন স্থানে আড্ডা পেড়ে কাজ করেছে। যারা চোরাচালানী এবং দুস্কৃতিকারী এদের সবার সংগে যোগাযোগ আছে হিম্মৎ খাঁর।

দিপালী এদের সবার সংবাদ জানে, কে কোথায় থাকে তাও জানে সে কারণ কৌশলে দিপালী সবার ঠিকানা সংগ্রহ করে রেখেছে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয়।

মোসলে উদ্দিন এবং তার সহকারীদল প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলো কারণ ফিরোজ রিজভী ও তার সঙ্গীদের নিহত সংবাদ তাকে শুধু বিচলিতই করেনি একেবারে মুষড়ে পড়েছিলো সে। কারণ তার ব্যবসার প্রথম পার্টনার ছিলো রিজভী। তারপর যখন শুনেছিলো দস্যু বনহুর তাদের হত্যা করেছে তখন তার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছিলো। সে মুহূর্তে তার আসে পাশে যারা ছিলো তারা কোনদিন ভুলবেনা মোসলে উদ্দিনের তখনকার মুখ ভাব। সে এক বিকৃত ভয় কাতর বীভৎস চেহারা।

মোসলে উদ্দিন মাথায় করাঘাত করেছিলো সেদিন গোপনে গোপনে, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সংবাদটা তার মৃতবৎ দেহে প্রাণের সঞ্চার এনেছিলো।

মোসলে উদ্দিন পুলিশ বাহিনীদের তোয়াক্কা করেনা শিউরে উঠেছিলো সে দস্যু বনহুরের নাম শুনে তারপর তার গ্রেপ্তারের কথা তাকে অসীম সাহসী করে তুলেছিলো। বেরিয়ে এসেছিলো সে তার গোপন আস্তানা থেকে। সুদুর কান্দাই শহরে এসে আবার সে ব্যবসা কেন্দ্রগুলোকে জাকিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে চলে ছিলো।।

হিম্মৎ খাঁ তাকে সহযোগীতা চালিয়ে এসেছে প্রথম থেকেই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু মোসলে উদ্দিন নয় চোরাকারবারীদের সঙ্গে শহরের যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের যোগাযোগ রয়েছে তাদের সবার সঙ্গেই যোগ সূত্র রয়েছে হিম্মৎ খাঁর।

ফিরুজা বন্দরের নিকটে ছিলো দিরু ফার্ম, ফিরোজ রিজভীর প্রধান এবং প্রকাশ্য ব্যবসা কেন্দ্র স্থল। ফিরোজ রিজভী ও তার দলবল নিহত হবার পর দিরু ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু প্রকাশ্যে বন্ধ হলেও আসলে দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে একটি গোপন আড্ডাখানা ছিলো। যেখানে আত্মগোপন করে সলাপরামর্শ করতো শহরের জাঁদরেল দুষ্কৃতিকারী দল এবং বেশ কিছু কক্ষে চোরা মাল এরা গুদামজাত করে রাখতো তারপর রাতের অন্ধকারে পাচার করতো ফিরুজা বন্দরে তারপর সেখান থেকে সব মাল চালান হতো জাহাজে দেশের বাইরে।

দরজাবিহীন গাড়িতে মাল বোঝাই করে চালান দিলো মোসলে উদ্দিন দিরু ফার্ম উদ্দেশ্যে।

গাড়ি বিদায় করে পুনরায় ফিরে গেলো যে সুড়ঙ্গ পথে সেখানে মিঃ হেলালীকে এনে বন্দী করে রাখা হয়ছে।

মিঃ হেলালীর সবেমাত্র সংজ্ঞা ফিরে এসেছে তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন একটি আধো অন্ধকারময় কক্ষে তিনি শুয়ে আছেন। স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন তিনি কোথায়। মনে পড়লো সব কথা, মিঃ হেলালী দাঁতে অধর চেপে ধরে নিজকে সংযত করে নিলেন। বুঝতে পারলেন তিনি এখন বন্দী। কান্তা বারের তলদেশে যে কোন এক অন্ধ গহ্বরে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে। জীবনে এই তার প্রথম পরাজয়।

হঠাৎ শব্দ হলো।

মিঃ হেলালী উঠে বসলেন, দেখতে পেলেন দু'জন লোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলো।

আধো অন্ধকার হলেও তিনি চিনতে পারলেন এই লোক দু'জনাকে কান্তা বারে দেখেছেন। মিঃ হেলালী কোন কথা না বলে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

লোক দু'জনের একজন হলো মোসলে উদ্দিন অপরজন হলো দেওয়ান রাব্বী।

এরা দু'জন এসে দাঁড়ালো মিঃ হেলালীর সম্মুখে। বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বললো মোসলে উদ্দিন—মিঃ হেলালী সাহেব ঘুঘু দেখেছিলেন ফাঁদ দেখেননি। এবার ফাঁদ দেখুন। বলুন কেনো এসেছিলেন কান্তা বারে?

মিঃ হেলালীর মুখ মন্ডল কালো হয়ে উঠলো। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হলো তার। তিনি দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রয়োজন বোধে এসেছিলাম।

হাঃ হাঃ হাঃ প্রয়োজন? কান্তা বারে পুলিশ সুপারের প্রয়োজন। কি প্রয়োজন এখানে জানতে পারি কি?

মিঃ হেলালী কোন কথা বললেন না।

মোসলে উদ্দিনই বললো আবার—সুন্দরী দিপালীর লোভে না কান্তা বারের গোপন তত্ব সংগ্রহ করতে?

এবার মিঃ হেলালী কথা বললেন—তোমার শেষের কথাটাই ঠিক মনে রেখো এবং তা সংগ্রহ করা আমার হয়ে গেছে।

তাই নাকি! কিন্তু কান্তা বারের গোপন তত্ব সংগ্রহ করে কি লাভ আপনার। কোনদিন আপনি এই ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পাবেন না।

মিঃ হেলালী রাগে ক্ষোভে নীরব রইলেন। কোন কথা তিনি বলতে পারলেন না।

এমন সময় এলো কান্তা বারের মালিক হিম্মৎ খাঁ। মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু তার চোখ দু'টো। এসে মিঃ হেলালীকে লক্ষ করে বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বললো—কি পুলিশ সুপার? কেনো এসেছিলেন?

মিঃ হেলালী কোন জবাব দিলেন না, জবাব দিলো মোসলে উদ্দিন—এসেছিলেন কান্তা বারের গোপন তত্ব জানতে কিন্তু......

বলো থামলে কেনো? বললো হিম্মৎ খাঁ।

মোসলে উদ্দিন তার বাকি কথা শেষ করলো—কিন্তু উনি আটকে গেলেন ফাঁদে বুঝলে হিম্মৎ খাঁ।

বুঝেছি! যাক্ এখন আমাদের কর্তব্য কি বলো? ওকে আটকে রাখবে না খতম করে দেবে?

যেটা তুমি ভাল বোঝ। তবে আমার মনে হয় আটকে রাখাই ভাল যদি এমন কোন সুযোগ আসে লাখ রুপিয়া যদি পাও।

আরে ছোঃ লাখ রুপিয়া! রেখে দাও তোমার লাখ রুপিয়া। কাল কেউটেকে কোনদিন জিইয়ে রাখতে নাই। হঠাৎ কোন সুযোগে ছোবল মারবে কে জানে।

মিঃ হেলালীর অসহ্য যন্ত্রনা বোধ হচ্ছিলো। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা, পিপাসায় কণ্ঠ নালী শুকিয়ে গেছে। কতক্ষণ যে তিনি সংজ্ঞাহীন ছিলেন নিজেই জানেন না। ওদের কথাগুলো তার শরীরে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিলো।

মোসলে উদ্দিনের সঙ্গী দেওয়ান রাব্বী হেসে বললো—বিষ দাঁত ভেংগে দিলে আর ছোবল মারতে পারবে না। একে হত্যা না করে বন্দী করে রাখাই শ্রেয় কারণ ভবিষ্যতে কোন কাজে আসবে।

হিম্মৎ খাঁ বললো—হাঁ ঠিক বলেছো ভায়া। ব্যবসা চালাতে গেলে কখন কি দরকার হয় বলা যায়না। পুলিশ মহল তো সব হুজুবুদ্ধ, ওদের সম্মুখে যা পড়ে তাই, পিছন দিয়ে হাতী গেলেও ওরা টের পায়না। কতদিন হলো আমরা কারবার চালিয়ে যাচ্ছি কেই নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচি করেছিলো? দেখেও ওরা না দেখার ভান করে তার মানে ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় তার মানে কেনো হয়রানি হতে যাবে। চোরামাল ধরা পড়লেই তো আবার নাও ঠেলা তাই......

বলে উঠে দেওয়ান রাব্বী—এতো বুঝেও তো মিঃ হেলালী সাহেব উঠে পড়ে আমাদের পিছু লেগেছিলেন এবার তাই বুঝুন মজাটা। কি হেলালী সাহে কথা বলছেন না কেনো?

বলে উঠলো মোসলে উদ্দিন—দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে এবার কোন বেটাকে আমরা কেয়ার করিনা। যত অনাসৃষ্টির মূলে ছিলো ঐ বেটা......

এমন সময় একজন লোক এসে হিম্মৎ খাঁর কানে কানে কিছু বললো।

সংগে সংগে হিম্মৎ খাঁ তার সংগীদের কানে মুখ নিয়ে কিছু বলতেই সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলো।

তবে মিঃ হেলালীর কানে এলো "রাজা কুমার জ্যোতির্ময়" শব্দটা তবু কতকটা অস্পষ্ট ভাবে।

ওরা চলে গেলো।

মিঃ হেলালী বার দুই ঐ নামটা মনে মনে স্মরণ করে নিলো রাজ কুমার জ্যোতির্ময় কিন্তু কে সে আর কান্তা বারের সংগে কি সম্বন্ধ। আর এদের সংগেই বা কি তার যোগাযোগ।

হঠাৎ মনে পড়ে জাংহার রাজ কুমারের নাম জ্যোতির্ময়। তবে কি রাজ কুমার জ্যোতির্ময় কান্দাই এসেছে? হয় তো তাই হবে কিন্তু কান্তা বারে কেনো সে?

মিঃ হেলালী তাকে দেখেনি কিন্তু তার সম্বন্ধে জানেন তিনি। জ্যোতির্ময় বহুদিন বিদেশে কাটিয়ে কিছুদিন হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। সেদিন জাংহায় মহা উৎসবের আয়োজন হয়েছিলো। বহুদূর দূরদেশ থেকে রাজা মহারাজা এবং মহারথীগণ এসেছিলেন জাংহায়। বনহুর দীন দুঃখীদের মধ্যে টাকা পয়সা বিতরণ করা হয়েছিলো সেদিন এ সব কান্দাইবাসীদের অজানা নেই।

নিশ্চয় জ্যোতির্ময় এসেছে কান্তা বারে। হয়তো তাকেও বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে...

মিঃ হেলালী ভেবে চলেছেন।

ওদিকে সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে হিম্মৎ খাঁ, মোসলে উদ্দিন, দেওয়ান রাব্বী। এরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে কান্তা বারে এসে পৌছায় ওরা।

জ্যোতির্ময় তখন কান্তাবারের অভ্যন্তরে একটি আসনে বসে আছে হেলান দিয়ে।

সম্মুখস্থ টেবিলে মূল্যবান সরাবের বোতল কাঁচ পাত্র এবং নানা রকম খাদ্য সম্ভার রয়েছে।

দিপালী নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে।

জ্যোতির্ময় এর দু'চোখে বিস্ময়, সে স্থির নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দিপালীকে।

এমন সময় হিম্মৎ খাঁ ও মোসলে উদ্দিন এসে অভিবাদন জানালো জ্যোতির্ময়কে।

জ্যোতির্ময় হেসে অভিবাদন গ্রহণ করলো।

দেওয়ান রাব্বী চলে গেলো ভিন্ন পথে।

মোসলে উদ্দিন ও হিম্মৎ খাঁ এসে বসলো জ্যোতির্ময়ের দু'পাশে।

ততক্ষণে দিপালীর নাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে চলে যায় কান্তা বারের অভ্যন্তরে।

জ্যোতির্ময়ের সম্মুখস্থ পান পাত্র থেকে সরাব পান করে চললো—মোসলে উদ্দিন। হিম্মৎ খাঁ ও তার সঙ্গে যোগ দিলো।

হিম্মৎ খাঁ এক সময় বললো—কুমার বাহাদুর আজ রাত্রি এই কান্তা বারে কাটাবেন বলে আশা করি। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনলো দিপালী, শিউরে উঠলো সে।

জ্যোতির্ময় রাজি হয়ে গেলো।

❑

অনেক রাত।

সমস্ত কান্তা বার নীরব নিঝুম।

কান্তা বারের সম্মুখে পার্ক করা গাড়িগুলো রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে সরে পড়েছে। যে দু'এক খানা ছিলো তাও এখন নেই।

শুধু একটি নতুন ঝকঝকে ধূসর রং এর টয়োটা গাড়ি এখনও কান্তা বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িখানা জ্যোতির্ময় এর কারণ সে কান্তা বার থেকে চলে যায়নি। জ্যোতির্ময় যে কক্ষে রয়েছে সে কক্ষ অদ্ভুতভাবে সাজানো। নীলাভো আলো জ্বলছে। যেলকুনিতে আলোর ঝাড় ঝুলছে।

নেশা জড়িত ঢুলু ঢুলু চোখে জ্যোতির্ময় উঠে দাঁড়ালো। দরজা বন্ধ করবার জন্য পা বাড়াতেই দিপালী প্রবেশ করলো অতি সন্তর্পণে।

জ্যোতির্ময় বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি!

হাঁ কুমার, আমি।

কি চাও?

কিছুনা।

তবে, কেনো এলে?

কুমার?

বলো!

কান্তা বারে আপনি আর আসবেন না।

কুমার জ্যোতির্ময় খপ করে ধরে ফেললো ওর একটি হাত— কেনো বলোতো?

এখানে বিপদ আছে।

বিপদ!

হাঁ।

দিপালী, আমি এখানে কেনো আসি জানো।

না। আপনি বসুন কুমার কারণ বেশি নেশা পান করায় আপনার দেহ টলছে।

বসবো?

হঁ বসুন। দিপালী জ্যোতির্ময়ের হাত ধরে বসিয়ে দেয় তার বিছানায়।

বলে এবার জ্যোতির্ময়—দিপালী জানো কেনো আসি?

বললাম তো জানিনা।

তোমার মোহ আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সত্যি দিপালী তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি ঐ দিন আমি আত্মহারা হয়ে গেছি। কি অমন করে কি

দেখছো? বুঝেছি ভাবছো এমনি করে আরও কত জনা বলে বা বলেছে এই তো। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছি ঐদিনই মন প্রাণে তোমাকে ভালবেসেছি। দিপালী, বলো তুমি আমায় ভালবাসতে পারোনা?

দিপালীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়েত লাগলো ফোট ফোটা অশ্রু। সে জীবনে বহু লোকের সান্নিধ্যে এসেছে, বহু কণ্ঠের আবেগ ভরা সুর তাকে অভিভূত করেছে কিন্তু এমন অন্তস্পর্শী কণ্ঠস্বর সে শোনেনি কোন দিন। দিপালী বলে উঠে—আমি যে অস্পৃশ্য।

হোক—তুমি হিন্দু আমিও তাই। তুমি মানুষ আমিও মানুষ। তুমি নারী আমি পুরুষ উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন।

কিন্তু...

কোন কিন্তু নয় দিপালী আমি তোমায় বিয়ে করবো।

কুমার।

হাঁ।

তা হয়না, আমি একজন নর্তকী...

মানিনা আমি সমাজের কোন কুসংস্কার। দিপালী আমি যদি তোমায় গ্রহণ করি কেউ বাধা দেবেনা। কারণ আমি এখন জাংহার অধিপতি।

শুনেছি আপনার পিতা......

না তিনি বেঁচে নাই।

কুমার আপনি এ সব কি বলছেন?

যা বলছি সত্য। এবং সেই কারণে আমার আজ কান্তা বারে রাত্রি যাপন।

কুমার।

তুমি অমত করোনা দিপালী। জ্যোতির্ময় ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চেপে ধরলো দিপালীর একখানা হাত।

দিপালী নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে রাজ কুমার জ্যোতির্ময়ের মুখে। নীলাভ আলোতে ঝলমল করছে কক্ষের বেলোয়ারীর ঝাড়গুলো। দেয়ালের

ছবিগুলোকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। ফুল দানী থেকে সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা পূর্ণ পরিবেশ।

দিপালী রাজ কুমার জ্যোতির্ময়ের জন্য এই কক্ষটি আজ মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছিলো।

কাশ্মীরী কন্যা দিপালীর মন রুক্ষ কঠিন ছিলো না। কোমল নারী হৃদয়ের অপূর্ব সংযোজন ছিলো তার মনে। রাজ কুমার জ্যোতির্ময়কে যেমন দিপালীর অপরূপ সৌন্দর্য মোহগ্রস্থ করেছিলো ঠিক দিপালীও সেদিন রাজ কুমার জ্যোতির্ময়কে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো।

উভয়ের মধ্যে যদিও আকাশ পাতাল প্রভেদ তবু নিজের অজ্ঞান্তে দুজনা উভয়ে উভয়কে গ্রহণ করে ছিলো মনে মনে।

রাজকুমারও তাকিয়ে আছে দিপালীর মুখের দিকে।

দিপালী ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

হঠাৎ এমন সময় একটা বাদ্য যন্ত্রের তীব্র আওয়াজ কানে আসে।

কোন রাজপথ থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। ক্রমান্বয়ে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

দিপালী বললো—কোন বিবাহ উৎসব হবে।

জ্যোতির্ময় বললো—দিপালী তুমি জানোনা আজ শহরের কোন কোন স্থানে আনন্দ উৎসব হচ্ছে।

কিসের আনন্দ উৎসব রাজ কুমার?

তুমি তাহলে শোননি দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় সুধি সমাজের মুখে হাসি ফুটেছে তাই তারা আজ আনন্দ উৎসব করছে।

শুনেছি! শুকনো মুখে উত্তর দিলো দিপালী।

জ্যোতির্ময় বললো—হঠাৎ অমন বিমর্ষ হলে কেন?

রাজ কুমার আপনি সুখী মানুষ বুঝবেন না কিছু। যাই এবার কেমন?

না, এসোছা যখন তখন প্রভাত পর্যন্ত তুমি থাকবে আমার পাশে।

আপনি ভুল করছেন রাজ কুমার।

কেন?

কান্তা বার আপনার জন্য নয়।

জানি আমি জানি বলেই এসেছি। দিপালী এই কান্তা বার তোমার জন্য ও নয়।

কুমার।

হাঁ, বলেছি এ কান্তা বার থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো।

রাজ কুমার সত্যি?

হাঁ সত্যি। শোন কান্দাই দিপালী উৎসবে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। রং এল রংএ সেদিন তোমার আসল রূপ ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো তবু আমি দেখেছিলাম তোমার ঐ নীল দুটি চোখে অপূর্ব এক ভাবের উন্মেষ। আমি দূর থেকে তোমাকে দেখেছিলাম।

দিপালী উৎসব?

হাঁ, আরও অনেক মেয়েদের সঙ্গে তুমিও গিয়েছিলে শহরের আলোক সজ্জা দেখতে। রং এর ফুলঝুরি ছিলো তোমাদের সবার হাতে। তোমরা নিজেরা নিজেরাই রং নিয়ে খেলছিলে ঠিক হোলিখেলার মত। তোমাদের সঙ্গে কতকগুলো ধনকুবেরু ছিলো—তারা তোমাদের দেহে রং ছিটিয়ে একাকার করে দিচ্ছিলো। অন্যান্য মেয়েরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো কিন্তু তুমি, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিলো তুমি মোটেই এতে খুশি ছিলেন। তোমার চোখে ফুটে উঠেছিলো এক অসহায় নিঃসঙ্গতার আভাষ। দিপালী বলো তুমি কি তোমার এ জীবনের জন্য খুশি নও?

বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, আমার এ জীবনের জন্য আমি একটুও খুশি নই।

আমি বুঝতে পেরেছি তাই......

তুমি উদ্ধার করবে আমাকে এই পাপ পুরী থেকে।

যদি চাও সেই জীবন......

চাই, আমি বাঁচতে চাই এখান থেকে। ......দিপালীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে বলে—দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় দেশের নর পশুর দল খুশি হয়েছে। কেউ তাদের মন্দ কাজে বাধা দিতে

আসবে না আর যেমন কান্তা বারের অভ্যন্তরে কত কুকর্ম চলেছে কে তার হিসাব রাখে। যাক কুমার যদি আপনি জানতেন তবে কোনদিন এখানে আসতেন না এখানে যারা আসে তারাই শয়তান নরপশু।

আচ্ছা দিপালী একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো।

বলুন?

একদিন যাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে এরা ছাড়া নতুন কেউ আসেনা কান্তা বারে, যেমন আমি নতুন এসেছি।

হাঁ আসে, কিন্তু সবার কথা কি আর মনে থাকে। রাজকুমার সেদিন এক ভদ্র যুবক এসেছিলেন সত্যি তার জন্য আমার দুঃখ হয়।

কেনো?

নানা এ কথা বলা চলবেনা।

দিপালী তুমি বিশ্বাস করো আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাকে তুমি বিশ্বাস করছো?

না।

তবে বলতে এতো বাধা কেনো?

আজ থেকে কিছুদিন আগের কথা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কান্তা বার সরগরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় কান্তা বারে এলো এক যুবক জানিনা কে সে, ও আমার সঙ্গে সঙ্গে কান্তাবারের পুরোন খদ্দের মোসলে উদ্দিন ও তার সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলো। আর কেউ লক্ষ্য না করলেও আমি লক্ষ্য করলাম এবং মনে মনে শিউরে উঠলাম কান্তা বারে কোন নতুন অতিথি এলে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর দায়িত্ব ছিলো আমার। আমি শয়তানদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে গেলাম কান্তা বারের অভ্যন্তরে। ঠিক পর পরই শয়তান দল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। ওরা ভদ্র যুবকটির অলক্ষ্যে কানে কানে কিছু বলে নিলো। আমি বুঝতে পারলাম সেই যুবকটিকে নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র চলছে।

থামলো দিপালী।

জ্যোতির্ময় যেন শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। বললো সে—তারপর কি হলো?

আমি মোসলে উদ্দিন ও তার দল বলের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে চুপি চুপি বললাম—পালিয়ে যান, পালিয়ে যান এখান থেকে কিন্তু তিনি আমার কথা কানে নিলেন না।

তারপর?

তিনি হাসলেন। আমি মনে করলাম যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতে হবে একটা ছোট চিরকুট এনে দিলাম তার হাতের মুঠায়। তিনি চিরকুট পড়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রইলেন। পারলাম না তাকে রক্ষা করতে।

দু চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো জ্যোতির্ময়—তাকে ওরা হত্যা করেছে?

না—তাকে ওরা হত্যা করেনি।

তবে কোথায়—কোথায় তিনি?

কান্তা বারের গভীর তল দেশে তাকে বন্দী করে রেখেছে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। সে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম কারা কক্ষ। যেখানে কেউ কোনদিন প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। শুধু কয়েকজন ছাড়া......সত্যি লোকটার জন্য দুঃখ হয় আমার।

একটা অজানা অচেনা মানুষের জন্য তোমার দরদ দেখে সত্যি আশ্চর্য হচ্ছি। তোমার মনের মহৎ পরিচয় আমাকে খুশি করেছে। একটু থেমে বললো জ্যোতির্ময়—তোমার পুরস্কার এই হীরক অঙ্গুরী। নাও...

জ্যোতির্ময় নিজের আংগুল থেকে হীরক আংগুরী খুলে পরিয়ে দেয় দিপালীর হাতে। তারপর বলে—হাঁ, কি বলছিলোম দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় তুমি খুশি হতে পারোনি?

না।

কেনো?

আপনি জানেন না রাজকুমার দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় দেশের দুস্কৃতিকারী দল নব উদ্দমে তাদের কুকর্ম চালিয়ে চলছে। আপনি যাদের

কথা একটু পূর্বে বললেন, ধনকুবের দল যারা আজ দস্যু বনহুর গ্রেপ্তারের অজুহাতে উৎসব দিবস পালন করে চলেছে তারা......

দিপালী এদের তুমি দুষ্কৃতিকারীর দলে ফেলেছো।

আপনি ঠিক্ জানেন না আসল দুষ্কৃতিকারী কারা।

তুমি জানো—জানো দিপালী।

বিশ্বাস করুন আমি না জেনে কোন কথা বলিনা। কান্তা বারে যারা আসে তারা প্রথম স্তরের দুষ্কৃতিকারী।

তুমি এদের কত জনার নাম জানো দিপালী?

অনেক?

তবুও?

দস্যু বনহুর হত্যা করেছিলো কয়েকজন চোরা চালানী ব্যবসায়ীকে কিন্তু এখনও তার বহু পার্টনার কান্দাই শহরের বুকে গোপনে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে যাদের সন্ধান জনসাধারণ তো জানেনেই না এমন কি পুলিশ বাহিনীও নয়। এরা বিড়াল তপস্বীর মত সাধু সেজে দেশ ও দশের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে আংগুল ফুলে কলা গাছের মত ফেঁপে উঠছে। এদের মধ্যে মোসলে উদ্দিন সিরাজী ও তার সহকারী হুম ইয়া, জারু, মহিস উদ্দিন, ফারুক হোসেন।

এরা সবাই দুস্কৃতিকারী?

শুধু এরাই নয় এদের যারা সহায়তা করে তারাও দুস্কৃতিকারী, এক নম্বর হলো আমার বাবা হিম্মৎ খাঁ আরও আছে তারা শহরের গণ্যমান্য স্বনাম ধন্য ব্যক্তি নাইবা শুনলেন তাদের নাম।

কুমার জ্যোতির্ময় দু'চোখ বিস্ফারিত করে দিপালীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো। বললো সে—যাক স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম শুনে তাদের সম্মানের হানি করা মোটেই উচিৎ নয়। থাক তুমি একটা গান শোনাও দিপালী রাতটা সার্থক হোক।

দিপালী বলে উঠে—না আজ গান নয় আজ শুধু কথা। কুমার আপনি কি পারেন না এদের সায়েস্তা করতে?

একটু হেসে বললো, কুমার জ্যোতির্ময়—যারা এদের সায়েস্তা করবে তারা তো পুলিশের লোক। দেখো দিপালী তুমি বলছো আমি শুনছি কিন্তু আমাদের কারো করবার কিছু নেই। তবে দুঃখ হয় দেশের কোটি কোটি মানুষ আজ ভুখা, ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আজ উন্মাদ প্রায়। দেহের মাংস কামড়ে খাবে ওরা এখন।

দিপালীর চোখ দুটো জ্বলে উঠে যেন, বলে সে—দেশের এ অবস্থার জন্য দায়ী কারা জানেন কুমার? ঐ সব নরপশুর দল যাদের নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়। এরা পরের মুখের খাবার লুটে নিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করে চলেছে। এদের কাছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন আফসোস নাই কারণ এরা দেশে ও দশের স্বনামধন্য ব্যক্তি। যে চাল দু'টাকা করে কিনবার সমর্থ নেই কারো অথচ এরা পাঁচ টাকা মূল্যেও কিনতে পারে কারণ এরা ধনকুবেরু। শুধু তাই নয় দেশের মুদ্রা বিদেশে পাচার করেও এরা টাকার পাহাড় বনে গেছে।

জ্যোতির্ময় দিপালীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—কিন্তু এরা কারা?

ঐ সব স্বনাম ধন্য ব্যক্তি যাদের দেশবাসী শ্রদ্ধা করে সমীহ করে। যাদের আছে গাড়ি বাড়ি ঐশ্বর্য। যাদের ফিরে তাকবার সময় নেই দুঃস্থ অসহায় মানুষদের দিকে। মীর্জা মোহাম্মদ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার খাদ্য শস্য দেশের বাইরে পাচার করে......

চুপ কে জেনো আসছে। বললো জ্যোতির্ময়।

দিপালী চুপ হয়ে গেলো।

জ্যোতির্ময় বললো—এবার তুমি যাও দিপালী রাত ভোর হয়ে আসছে।

হাঁ, আমি যাচ্ছি।

দিপালী বেরিয়ে যায়।

জ্যোতির্ময় ভাবতে থাকে দিপালীর কথাগুলো তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

❑

মিঃ হেলালীর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জন্মেছে। চোখ দু'টো কোঠরাগত। চোয়ালের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে এক ইঞ্চি করে। চুল গুলো রুক্ষ। হাতগুলো পিছমোড়া করে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে একটি লৌহ থামের সঙ্গে।

মিঃ হেলালীর সমস্ত দেহে চাবুকের আঘাতের গভীর কালো দাগ পড়ে গেছে। জামা কাপড় ছিড়ে গেছে চাবুকের আঘাতে।

দিনে দুটো শুকনো রুটি তাকে খেতে দেওয়া হয় আর ছোট এক গেলাস পানি। তবু পরিস্কার সচ্ছ পানি নয় অপরিস্কার পানি তাকে পান করতে দেয় ওরা।

শুধু মিঃ হেলালী নয় এমনি বহু অমূল্য জীবনকে এরা এমনি করে গোপন কারা কক্ষে তিল তিল করে শুকিয়ে মেরেছে। এরা সভ্য সমাজে নামি দামি গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত কিন্তু এরা দেশের ও সমাজের কলঙ্ক। এদের হাতে রয়েছে দেশের দুষ্কৃতিকারী গুন্ডাদল। সুযোগ বুঝে এরা লুট তরাজ এবং হাইজাক করে বেড়ায়। অবশ্য যারা জনগণের হাতে ধরা পড়ে তাদের আর বিচারের জন্য পৃথিবীর আদালতে নিতে হয়না বিচার হয়ে যায় জনগণের আদালতে। তবু এদের লজ্জা নেই, লজ্জাহীন নরপশুর দল এরা।

মিঃ হেলালীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন নর শয়তান এরা কয়েকদিন ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিলো তাই আসতে পারেনি আজ এসেছে অবসর হয়ে। কারো হাতে হুইস্কির বোতল, কারো হাতে সরাব পাত্র কারো হাতে চাবুক।

মিঃ হেলালীকে ঘিরে চলেছে নানা রকম বিদ্রুপ তিরস্কার লাথি আর চাবুকের আঘাত। কেউ বা গেলাসের পর গেলাস হুইস্কি পান করে বাকিটুকু ছুড়ে মারছে মিঃ হেলালীর মুখে।

মিঃ হেলালী নিরুপায়, সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন। সরাবগুলো তার চোখ মুখে বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি।

মিঃ হেলালী ভাবতে পারেন নি এখানে এসে তার অবস্থা এমন দাঁড়াবে। তিনি চেয়েছিলেন দুষ্কৃতিকারীদের সন্ধান করে তাদের সায়েস্তা করা কিন্তু একটা বিরাট ষড়যন্ত্র তাকে অক্টোপাশের মত গ্রাস করে ফেলেছে। এখন থেকে কোনদিন তিনি পৃথিবীর আলোতে ফিরে যেতে পারবেন কিনা কে জানে।

❑

দিরুফার্ম থেকে কেউ যেন ফোন করলো। ফোন ধরলেন মিঃ ইলিয়াস। ওপাশ থেকে দিরু ফার্মের কোন এক কর্মচারী বলছেন —আমাদের দিরু ফার্মে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে এক্ষুণি আসুন:..

মিঃ ইলিয়াস তক্ষুণি জানিয়ে দিলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীকে।

মিঃ জায়েদী সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করে চা পান আশায় প্রস্তুত হয়ে বসেছেন ঠিক ঐ মুহূর্তে মিঃ ইলিয়াসের ফোন পেলেন। শিউরে না উঠলেও চমকে উঠলেন তিনি, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন— আবার খুন!

কোন রকমে চা পান শেষ করে বেরিয়ে পড়লেন দিরু ফার্মের উদ্দেশ্যে। মিঃ ইলিয়াস এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার প্রস্তুত ছিলেন তাদেরকে তুলে নিলেন পুলিশ অফিস থেকে।

দিরুফার্মে পৌছতেই দিরুফার্মের ম্যানেজার রশিদ উল্লাহ এসে এগিয়ে নিলেন। দিরুফার্মের প্রতিটি কর্মচারীর মুখমন্ডলে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠেছে। রশিদ উল্লাহ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে ভিতরে গেলেন। অনেকগুলো গুদাম কক্ষ পার হয়ে একটা বিরাট গুদাম কক্ষ। কক্ষের দরজায় তালা বন্ধ।

মিঃ জায়েদী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার সহ রশিদ উল্লাহ এসে দাঁড়ালেন তারা বন্ধ গুদাম কক্ষটার সম্মুখে। রশিদ উল্লাহ কোমর থেকে বের করলো একটা চাবির থোকা। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলে ফেলতেই দরজা আপনা আপনি খুলে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রধান ও তার সহকর্মীগণ শিউরে উঠলেন। দেখতে পেলেন প্রশস্ত একটি কক্ষ, কক্ষটি কোন এক গুদাম কক্ষ তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া এ কক্ষটি সম্পূর্ণ একটি গোপন কোন আড্ডাখানা। কক্ষের চার পাশে কাঠের বাক্স বিক্ষিপ্ত ছড়ানো রয়েছে। মাঝে কয়েকটা চেয়ার এবং একটি টেবিল। প্রত্যেকটা চেয়ারে একটি করে লোক বসে আছে কিন্তু আশ্চর্য কারো দেহে মাথা নেই।

মস্তক বিহীন লাশ।

পুলিশ প্রধান এবং তার সহকারীগণ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারা জীবনে বহু মৃত দেহ দেখেছেন কিন্তু এমন বিস্ময়কর মৃতদেহ দেখেন নাই।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করলেন তাঁরা। সাহসী পুলিশ অফিসারগণের হৃদয়ও কেঁপে উঠলো। প্রতিটি চেয়ারের সঙ্গে প্রত্যেককে পিছমোড়া করে বেঁধে সেই অবস্থায় তাদের দেহ থেকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়েছে।

হত্যালীলা যখনই ঘটুক তার রক্ত একেবারে শুকিয়ে যায়নি। প্রত্যেকটা চেয়ার গড়িয়ে চেয়ারের তলায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

মৃত দেহের জামা কাপড় রক্তে ভিজে পুনরায় শুকিয়ে উঠেছে। চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে স্থানে স্থানে। রক্তের কেমন যেন একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে জানালা বিহীন গুদাম কক্ষটার মধ্যে।

কক্ষ মধ্যে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছিলো কাজেই সবকিছু স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের যেন এতোক্ষণে হুস হলো। তাঁরা দেখলেন এক সঙ্গে সাতটি মৃত দেহ সাতখানা চেয়ারে বসা

রয়েছে। আশ্চর্য মস্তক বিহীন মৃতদেহগুলির একটির মস্তকও দুর্গম কক্ষের মেঝেতে পড়ে নেই।

পুলিশ অফিসার মহোদয়গণের চক্ষুস্থির। মৃতদেহ আছে অথচ মাথা নেই। মাথা গেলো কোথায়? আর কারাই বা এভাবে একসঙ্গে এতোগুলো হত্যালীলা সংঘটিত করেছে।

মিঃ জায়েদী স্বাভাবিকভাবে একবার কক্ষটার মধ্যে দেখে নিলেন তারপর দিরুফার্মের ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে বললেন—এই অদ্ভুত হত্যাকান্ড সম্বন্ধে আমি আপনাকে এবং দিরুফার্মের কর্মচারীগণকে কিছু প্রশ্ন করবো।

শসব্যস্তে বললেন বৃদ্ধ রশিদ উল্লাহ—বলুন স্যার।

মিঃ জায়েদী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা রশিদ সাহেব, যারা মস্তকহীন অবস্থায় চেয়ারে বসা তারা কারা এবং এখানে কি কারণে এ ভাবে বসেছিলেন? নিশ্চয়ই সঠিক জবাব দেবেন?

বৃদ্ধ একসঙ্গে এতোগুলো হত্যাকান্ড জীবনে দেখেননি এবং এতো রক্তও তিনি দেখেননি কোনদিন। ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি প্রথম থেকেই ঢোক গিলে তিনি জবাব দিলেন মিঃ জায়েদীর—স্যার, দিরু ফার্মের ম্যানেজার হলেও আমি দিরুফার্মের অনেককেই চিনিনা। কারণ দস্যু বনহুর দিরুফার্মের মালিক ও তাঁর সহকর্মীদের হত্যা করার পর আমাকে দিরুফার্মের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা হয়।

মিঃ ইলিয়াস বলে উঠলেন—পূর্বের ম্যানেজার কি হলেন?

সেই হত্যাকান্ডের পর ম্যানেজার ভয় পেয়ে চাকুরী ত্যাগ করে চলে যান।

পুনরায় মিঃ ইলিয়াসই প্রশ্ন করলেন—একজন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন আর আপনি সেই নৃশংস হত্যালীলার কথা জেনেও সেই দিরুফার্মের চাকুরীতে জয়েন করলেন আশ্চর্য বটে।

হাতের মধ্যে হাত কচলে বললেন রশিদ উল্লাহ—আমি প্রাণের মায়া করিনা এবং করিনা বলেই দিরুফার্মে ম্যানেজারের চাকরীটা নিয়েছি।

সংসারের প্রয়োজনে আমি দিরুফার্মে কাজ করলেও এখনও সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠিনি।

মিঃ জায়েদী গম্ভীর গলায় বললেন—তা হলে আপনি বলতে চান যারা এখানে মস্তকহীন অবস্থায় চেয়ারে বসে আছেন তাদের কাউকেই আপনি চেনেন না?

সত্যি বলতে কি আমি এদের কাউকেই চিনি না এমন কি এরা এখানে কেনো বসেছিলেন তাও জানি না।

তবে কে জানে?

দারওয়ান রেওয়াজ খান পুরোন মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সঠিক কথা বলতে পারবে।

দিরু ফার্মের শ্রমিক এবং কর্মচারীবৃন্দ সবাই এসে ভীড় জমিয়েছিলো। কিন্তু দারওয়ান রেওয়াজ খান কোথায়। অনেক ডাকা ডাকি হাঁকাহাঁকির পর রেওয়াজ খান এলো। সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিয়েছিলো আর ভোর রাতে খানিকটা নেশা পার করে ওর ছোট্ট ঘরটার মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো। ডাকা ডাকি শুনে দুলতে দুলতে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দৃষ্টি সম্মুখে ফেলতেই আর্তনাদ করে পাশেই দন্ডায়মান মিঃ জায়েদীকে জড়িয়ে ধরলো। সে ঐ মস্তকহীন রক্তাক্ত দেহগুলি দেখে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

একটু সামলে নিয়ে চোখ মেললো দারওয়ান রেওয়াজ খান, ভয় বিহবল ভাবে তাকালো সে মস্তক বিহীন লাশগুলোর দিকে।

মিঃ জায়েদী তীক্ষ্মদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—এরা কারা এবং কে এদের এ ভাবে হত্যা করেছে? বলো তুমি এ সম্বন্ধে কি জানো?

রেওয়াজ ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো—হুজুর কে এদের হত্যা করেছে আমি জানি না তবে এরা কারা আমি বলতে পারবো।

শুধু তই নয় এরা এখানে কি করছিলো তাও জানো তুমি নিশ্চয়ই?

হুজুর আমি জানি না।

মিঃ ইলিয়াস হুঙ্কার ছাড়লেন—নেকামী করো না যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে জবাব দাও।

মিঃ জায়েদী বললেন—এরা কে এবং কারা বলো?

রেওয়াজ খান এবার এগুলো, লাশগুলোর দিকে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো—এই ইনি হলেন দিরু ফার্মের পুরনো ম্যানেজার ইউসুফ নিয়াজী...

মিঃ জায়েদী তাকালেন নতুন ম্যানেজার রশিদ উল্লার দিকে, বললেন—আপনি একটু পূর্বে বললেন পুরোন ম্যানেজার সেই হত্যাকান্ডের পর চাকুরী ত্যাগ করে চলে গেছেন অথচ...আংগুল দিয়ে দেখালেন—রেওয়াজ খান বলছে এই মস্তক বিহীন দেহটা পুরোন ম্যানেজারের।

স্যার আমি ঠিক চিনতে পারিনি তাছাড়া তিনি এখানে কখন কোন পথে এসেছেন তাও আমি জানি না।

মিথ্যা কথা। আপনি নিশ্চয়ই গোপন করছেন আসল কথা।

স্যার বিশ্বাস করুন আমি এই গুদাম কক্ষে কোন সময় আসিনি।

জানিনা এখানে কি রাখা হয় এবং এরা এখানে বসে কি করেন।

মিঃ জায়েদী ফিরে তাকালেন রেওয়াজ খানের দিকে। বললেন— পরের চেয়ারে কে ইনি?

রেওয়াজ খানের নেশার ঘোর এতোক্ষণে সম্পূর্ণ কেটে গেছে, সে প্রত্যেকটা মস্তক বিহীন দেহ ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছিলো, বললো—হুজুর পরের চেয়ারে আমাদের মালিকের প্রধান বন্ধু মোসলে উদ্দিন সিরাজীর দেহ বলে মনে হচ্ছে। ঐ তো তার—ডান হাতের একটা আংগুল নেই।

আচ্ছা তার পরেরটা?

হুজুর এটা ঠিক চিনতে পারছি না তবে তার পরেরটার নাম ছিলো হুমাইয়া, বড্ড শয়তান লোক। হুজুর আমি বেটাকে মোটেই ভাল নজরে দেখতাম না।

যাক সে কথা বলো তার পরেরটা কে?

এরা সবাই মোসেলে উদ্দিনের লোক নামও জানি হুজুর।

জানো তবে বলো?

হুজুর এটা মহিস উদ্দিন, এটা জারু, এটা ফারুক হোসেন। এরা সবাই বদ লোক হুজুর।

এরা বদ লোক কি করে জানলে তুমি।

হুজুর সব সময় খালি রিজভী সাহেবের কাছে আসা যাওয়া করছে আমি জানবো না।

তবে তুমি আরও খোঁজ খবর জানো?

তা কিছু কিছু জানি বই কি।

বলো এরা এখানে বসে কি করছিলো, মাঝখানে টেবিল আছে অথচ টেবিলে কিছু দেখছি না।

ঐ কথা আমিও বলতে পারবোনা তবে ঠিক প্রতি রোববারে ফার্ম বন্ধ থাকাকালে এই গুদাম ঘরে এরা গোপনে বসতো এই জানি। হুজুর দারওয়ান বলে কেউ আমাকে গোপন কথা বলতো না তা ছাড়া আমাকে ওরা বলবেই বা কেনো। পেটের দায়ে দিরু ফার্মে কাজ করি সব দেখেও না দেখার ভান করি সব বুঝেও না বোঝার...

বুঝেছি তুমি অত্যন্ত চালাক লোক। বললেন মিঃ ইলিয়াস!

হাসলো দারওয়ান—হুজুর আজকাল চালাক হলেও বোকা বনে থাকতে হয়। জেনেও না জানার ভান করি বলেই আজও ছিলাম বা আছি। এই যে এ ধারে যে মাথা কাটা লাশটা দেখছেন এটা কান্দাই শহরের বড় নামি ধামি লোক হুজুর। যদিও এনাকে প্রকাশ্যে এখানে আসতে দেখিনি তবু চিনতে আমার ভুল হবে না কারণ একে গোপনে আসতে দেখেছি অনেকবার। হুজুর নাম বলবো না।

তবে তোমাকেও গ্রেপ্তার করা হবে। বললেন মিঃ জায়েদী।

বললো রেওয়াজ খান—বললে আমার তো কোন দোষ হবে না?

না বরং সত্য সত্য কথা বললে তুমি বেঁচে যাবে। বললেন ইলিয়াস সাহেব।

রেওয়াজ খান বললেন—হুজুর ইনি সরকারের লোক মানে আপনাদের দলের লোক।

বলো অমন হেয়ালী করোনা রেওয়াজ খান। বললেন নতুন ম্যানেজার রশিদ উল্যাহ।

পুলিশ অফিসারগণ তখন তীক্ষ্ণ নজরে লাশটাকে চিনবার চেষ্টা করছেন কিন্তু কেউ চিনতে পারছেন না।

রেওয়াজ খানই বললো—কান্দাই এর নামিধামি মানুষ মির্জ্জা মোহাম্মদ!

রেওয়াজ খান বললো—হাঁ ইনিই তো কান্দাই শহরের মানুষের মুখের খাবার গোপনে সংগ্রহ করে বাহিরে পাচার করেন। হুজুর এখানে তারই কোন গোপন বৈঠক হচ্ছিলো।

মিঃ জায়েদী এবং তার সঙ্গীদের মুখমন্ডল মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাশে হলো। সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ী করে নিলেন। শুধু বিস্ময়কর হত্যাকান্ড নয় একেবারে আশ্চর্যকর ঘটনা—মীর্জ্জা মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন।

রেওয়াজ খান এর বেশি কিছু বলতে সক্ষম হলো না। তবু আরও কিছুক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন মিঃ জায়েদী। রেওয়াজ খান ছাড়াও যারা দিরুফার্মে কাজ করে তাদের প্রায় সবাইকে নানা রকম প্রশ্ন করলেন কিন্তু কোন হদিস খুঁজে পেলেন না তারা।

মিঃ জায়েদী বললেন—পূর্বে হলে মনে করা হতো এ দস্যু বনহুরের কীর্তি কিন্তু এ হত্যাকান্ড সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এবং রহস্যপূর্ণ। কে বা কারা এ হত্যালীলা সংঘটিত করেছে কে জানে।

এই মস্তক বিহীন লাশগুলোর কথা সমস্ত শহরে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার লোক ভীড় জমালো দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে।

নানাজনের নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। যাদের মস্তক বিহিন লাশ পাওয়া গেলো—তারা সত্যি রেওয়াজ খানের সনাক্তা ব্যক্তি কিনা এ কারণে লাশগুলি যেভাবে ছিলো সেই ভাবেই রাখা হলো।

দিরু ফার্মের পুরোন কর্মচারীগণকে ডেকে নানা রকম কৈফিয়ৎ তলব করতে লাগলেন মিঃ জায়েদী এবং মিঃ ইলিয়াস। কিন্তু কোন হদিস পেলেন না এই হত্যাকান্ডের।

মিঃ জাফরীও সংবাদ শুনে গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন, তিনি নিজেও এ হত্যাকান্ড দেখে বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তার সন্দেহ হলো—এটা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাঙ্গেরী কারাগারে ফোন করলেন। সেখানে ফোন করে জানতে পারলেন দস্যু বনহুর ঠিকই আটক আছে। কাজেই এটা দস্যু বনহুরের দ্বারা সংঘটিত হয়নি বুঝতে পারলেন তারা।

এতোগুলি মস্তক বিহিন দেহের মস্তকগুলো গেল কোথায়। সমস্ত দিরু ফার্মের অভ্যন্তরে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও কোন স্থানে একটি মস্তকও পাওয়া গেলো না। এতোগুলি মস্তক যেন হাওয়ায় উধাও হয়েছে।

লাশগুলো নিয়ে শহরে দারুন চাঞ্চল্য দেখা দিলো। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেলো এই হত্যালীলা আচম্বিতে সংঘটিত হয়নি। হত্যার পূর্বেই এদের হৃৎপিন্ড মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিলো। দারুন নির্যাতন দ্বারা এদের হত্যা করা হয়েছে।

এই মৃত্যু সংঘটিত হবার ঠিক দু'দিন পর একই ভাবে একটি চলন্ত ট্রেনের কামরায় তিনটি মস্তক বিহিন মৃতদেহ পাওয়া গেলো।

এই ট্রেনটি বিশেষ কোন ট্রেন ছিলো, যে ট্রেনে সাধারণ যাত্রীর আরোহণ নিষিদ্ধ ছিলো। কান্দাই এর বিশিষ্ট নাগরিকগণই এই ট্রেনের যাত্রী হতে পারতেন।

বিশেষ ট্রেনটির বিশেষ একটি কামরায় এই মস্তক বিহীন তিনটি লাশ ছিলো। ট্রেনটি যখন কান্দাই ত্যাগ করে কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো তখন হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে।

কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করার পরেই ছোট্ট ষ্টেশন জংতু। ঐ জংতু ষ্টেশনেই দেখা গেছে মস্তক বিহীন লাশ গুলো। এই মৃতদেহ পুলিশ দেখার পর পুনরায় ট্রেন খানা কান্দাই ফিরে আসে।

পুলিশ মৃতদেহ সনাক্ত করার পর মাথায় বজ্রাঘাত হলো কান্দাই বাসীর যারা নিহত হয়েছেন তারা কান্দাই এর বিশিষ্ট নাগরিক। এরা তিন জনই

সরকারের সম্মানিত পদের অধিকারী দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান এবং হাসান কাদেরী।

পুলিশ অনেক তদন্ত করেও এই হত্যা রহস্যের কোন "ক্লু" আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। পর পর এই আশ্চর্যজনক হত্যাকান্ড জনগণকে একেবারে ভীত করে তুললো।

জনগণ ভেবে পাচ্ছেনা দেশের এই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ এভাবে নিপাত হচ্ছে কেনো। সবার মনেই প্রশ্ন কিন্তু কেউ এর সমাধান খুজে পাচ্ছেন না।

দেশের জনগণ জানেন এরা দেশ ও দশের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কিন্তু আসলেই কি তাই?

সেদিন দিরুফার্মে বীভৎস হত্যাকান্ড সংঘটিত হবার পর কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করার মতলবে ছিলেন এবং সে কারণেই দেশ ত্যাগ করে আত্মগোপন আশায় দেশের বাইরে যাচ্ছিলেন দেওয়ান রাব্বী, গোলাম সোবহান, এবং হাসান কাদেরী কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যেমন চিরকাল ব্যর্থহ য়ে এসেছে অসৎ প্রচেষ্টা। অন্যায় কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা পারবেও না। নিয়তীর হাতছানিতে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।

পুলিশ মহল এই হত্যাকান্ডের তদন্ত ব্যাপার নিয়ে হীমসীম খেয়ে পড়লেন। তারপর মিঃ হেলালীর অন্তর্ধান পুলিশ মহলে এক ভীষণ দুর্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলো। অনেকেরই ধারণা এ হত্যালীলা দস্যু বনহুরের অনুচরদের কাজ এবং মিঃ হেলালীকে নিখোঁজ করেছে তাও এদেরই যড়যন্ত্রে।

মিঃ হেলালীকে নিয়ে পুলিশ মহল নানাভাবে শহরে তল্লাশী চালিয়ে চলেছেন কিন্তু কোথাও তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

পুলিশ মহল অবশ্য জানেন যে মিঃ হেলালী কান্তা বারে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি উধাও হয়েছেন। এজন্য কান্তা বারে তল্লাশী চালিয়ে ছিলেন রীতিমত ভাবে কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

❑

প্রতিবারের মত এবার দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগারে হাত পা খোলা অবস্থায় রাখা হয়নি তাকে কারাগার কক্ষে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে! শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দস্যু বনহুরকে আহার নিদ্রা সম্পন্ন করতে হয়। সাধ্য নাই সে এই লৌহ কারা কক্ষ থেকে লৌহ শৃঙ্খল মুক্ত করে পালাতে সক্ষম হবে।

কাজেই দস্যু বনহুর সম্বন্ধে পুলিশ মহল নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর হত্যালীলা কে বা কারা সংঘটিত করে চলেছে পুলিশ মহল কিংবা গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে এতোটুকুও ক্লু আবিষ্কার করতে পারছেন না।

কান্দাই প্রেসিডেন্ট আবু গাওসের কড়া হুকুম দিয়েছেন এরপর যদি এই ধরণের হত্যালীলা কান্দাই শহরের বুকে সংঘটিত হয় তাহলে পুলিশ মহলকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

এ কারণে পুলিশ মহলের তোড় জোড় পূর্বের চেয়ে আরও শত গুণ বেড়ে গেছে। গোয়েন্দা বিভাগের মুহূর্ত বিশ্রাম হচ্ছে না, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সবাই এই হত্যারহস্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন।

একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তবু কিন্তু হচ্ছেনা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রহমান পেরেশান হয়ে পরিশ্রম করে চলেছেন পুলিশ প্রধানগণ। এক মুহূর্ত যেন কারো অবসর নেই নিশ্বাস ফেলার। বিনা কারণে অনেককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং তাদের মারপিট করে নানা রকম কৈফিয়ৎ তলব করা হচ্ছে।

সাধারণ নাগরিক জীবন ক্রমান্বয়ে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। একদিকে পুলিশ মহলের তৎপরতা অপর দিকে প্রতি মুহূর্তে জীবন নাশের ভয়। এ যেন এক মহা সঙ্কটময় অবস্থা।

এমনি দিনেও কান্তা বারে জনগণের ভীড় কমেনি। তবে হিম্মৎ খাঁ দমে গেছে একেবারে কারণ তার বিশিষ্ট কয়েকজন পার্টনার এবং সহকারীর অদ্ভুত মৃত্যু তাকে শুধু ভীতই করেনি ভিতরে ভিতরে সে দমে গেছে একেবারে।

আজকাল সে অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করে থাকে, না জানি কখন তার ভাগ্যে কি ঘটবে কে জানে। তার পুরোন বন্ধুদের মধ্যে যারা আছে তারা তাকে নানা ভাবে সাহস যুগিয়ে আসছে।

সেদিন কান্তা বারের অভ্যন্তরে একটি গোপন কক্ষে কয়েকজন বসে গোপন আলোচনা করছিলো। হিম্মৎ খাঁর কয়েকজন সহকারী ছাড়াও সেখানে ছিলো শহরের কয়েকজন নামি মানুষ, যারা এক এক জন উচ্চ পদের অধিকারী।

হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে তাদের গোপন ব্যবসা নিয়ে আলাপ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব।

ব্যবসাটা সাধারণ ব্যবসা নয় বিদেশ থেকে যে সব সাহায্য দ্রব্য কান্দাই দুঃস্থ জনগণের জন্য পাঠানো হয় এ গুলোর মোটা অংশ কান্দাই পৌঁছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে বিক্রয় হয়ে যায়। সাহায্য দ্রব্য বিক্রয় করে এই সব স্বনাম ধন্য ব্যক্তিগণ কোটি কোটি টাকার মালিক বনে বসে আছেন। কান্দাই শহরে একটি বা দুটি নয় গুটি কয়েক বাড়ি গাড়ি এবং ইন্ডাষ্ট্রি ও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

অসহায় মানুষের মুখের আহার চুরি করে যে ইমারৎ গড়ে তুলছে দেশে তাঁদের সেই ইমারৎ ভোগ দখলে আসে কিনা এ সব নিয়েই আলোচনা চলছিলো।

হিম্মৎ খাঁ বললো—বেটা দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে ভেবেছিলাম এবার আমরা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাবো কিন্তু কে যে এমন শয়তানী শুরু করলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।

মোসিয়ে খান ইনি একজন দেশে প্রেমিক এবং সমাজ সেবক গরীবের পরম বন্ধু নামে খ্যাত তিনি মুখে সদা সর্বদা তোওবা তোওবা বলেন। পরের

জিনিসে তার মোটেই লোভ নেই তবে কিছু টাকা পয়সা তাঁর ভাগ্যে এসেছে যেমন ছাপ্পরে ফেঁড়ে আসে তেমনি করে।

সেবার কান্দাই দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। সমস্ত দেশ ব্যাপি হাহাকার। নানা রকম রোগে শোকে মানুষ মরতে লাগলো। কারণ তারা ক্ষুধার জ্বালায় অখাদ্য ভক্ষণ করে নানা রকম অসুখে পড়লো। এ সংবাদ বাইরের দেশ জানতে পেরে নানা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধপত্র সাহায্য পাঠাতে শুরু করলো। তখন মোসিয়ে খান হলেন এই সাহায্য কমিটির প্রধান কাজেই পয়সা আপনা আপনি পায়ে হেটে তাঁর কোঁচড়ে আসতে লাগলো। তিনি দু'হাতে এ সব পয়সা লুটে নিতে লাগলেন। কাজেই পয়সা তার ভাগ্যে ছাপ্‌ড় ফেঁড়েই এসেছে। সেই পয়সায় সামান্য কয়েকখানা বাড়ি গাড়ি করতে পেরেছেন এই যা।

যা হোক এতোদিন বেশ আরামেই কাটছিলো হঠাৎ দেশের আবহাওয়া যেন পালটে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। দেশের জনগণ কোনদিন হিসাব নিকাশ নিতে আসেনি, তিনি এতো টাকা পয়সা বা ঐশ্বর্য কোথায় পেলেন কেউ কোনদিন কৈফিয়ৎ তলব করেনি। এতোদিনে মনের মধ্যে এমন একটা দুশ্চিন্তা আসেনি যে তার ভাগ্যাকাশে কোনদিন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে পারে।

উপস্থিত তার কয়েকটি খাদ্য গুদামে বহু খাদ্য মজুত আছে। প্রায় লক্ষ লক্ষ মন চাল গম তিনি জমা রেখেছেন সুযোগ বুঝে ছাড়বেন যাতে দশ গুণ মুনাফা আসে।

যত ভাবনা মোসিয়ে খানের এই গুদামজাত মালের জন্য। তাই গোপনে বৈঠক ডেকেছেন এ মাল কি ভাবে দেশ থেকে বিদেশে পাচার করা যায়। তা ছাড়া ইদানিং যে ভাবে হত্যালীলা শুরু হয়েছে তাতে কখন যে তাঁর জীবনাকাশে কুয়াশা নেমে আসবে কে জানে। তাছাড়া উপস্থিত কিছু সাহায্য দ্রব্যের মোটা মাল হিম্মৎ খাঁর নিকটে বিক্রয় হয়ে গেছে তারও হিসাব নিকাশ হবে আজ।

হিম্মৎ খাঁর কথায় বললেন মোসিয়ে খান—আমার মনে হয় যারা এমন ভাবে বেছে বেছে হত্যা করছে তারা শুধু মানুষ নয় দুস্কৃতিকারী।

হিম্মৎ খাঁ হেসে বললো—দুস্কৃতিকারী আর শয়তান তফাৎ কি ঐ একই কথা।

কিন্তু আশ্চর্য আমরা কত গোপনতা সহকারে কাজ করি তা ঐ দুস্কতিকারীরা জানলো কি করে? দেখছো না কেমন নিখুঁতভাবে হত্যালীলা চালিয়ে চলেছে।

হিম্মৎ খাঁ তার গোঁফে তা দিয়ে বললো—যতই যা করুক কারো সাধ্য নেই কান্তা বারে প্রবেশ করে। দেখুন মোসিয়ে খান আমাদের ব্যবসা কেউ বন্ধ করতে পারবেনা।

কিন্তু গুদামের মাল কোন পথে চালান করবো হিম্মৎ খাঁ বলে দাও? আমার মাথাটা যেন কেমন করছে। হঠাৎ যদি কোনক্রমে দৃস্কুতিকারীরা জানতে পারে।

আপনি নির্ভয়ে থাকুন সাহেব কোন চিন্তা করতে হবে না আপনাকে গুদামে মাল আছে চিন্তা আমার আছে আপনি শুধু টাকার মালিক। মাল নিয়ে টাকা দিয়ে দিবো। আগামীকাল রাত তিনটায় আমাদের ট্রাকগুলো যাবে। খেয়াল রাখবেন কেমন।

আচ্ছা ঠিক খেয়াল থাকবে। কিন্তু...

কোন কিন্তু নাই সাহেব মাল বোঝাই ট্রাকগুলো রাতের অন্ধকারে কান্দাই ত্যাগ করে চলে যাবে কেউ টেরও পাবেনা। প্রত্যেকটা গাড়ির গায়ে রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা আছে কাজেই কেউ দেখে ফেললেও ভয়ের কোন কারণ নাই......কে কে ওখানে? বললো হিম্মৎ খাঁ।

এগিয়ে এলো দিপালী—বাবা আমাকে তুমি ডেকেছো?

না। এতো রাতে জেগে আছিস?

বাবা তুমি শোবে কখন?

তাই দেখতে এসেছিস বেটি?

হাঁ বাবা।

যা তুই চলে যা আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা। দিপালী এগিয়ে যায় তার নিজের কক্ষের দিকে।

পা বাড়াতেই অন্ধকারে কেউ যেন তার সম্মুখে দাঁড়ালো।

দিপালী চমকে চিৎকার করতে যাচ্ছিলো কিন্তু চিৎকার করবার পূর্বেই তার মুখে হাত চাপা দেয় রাজকুমার জ্যোতির্ময়।

দিপালী চাপা কণ্ঠে বলে—কে?

জ্যোতির্ময় বলে উঠে—আমি।

রাজ কুমার।

হাঁ।

আপনি এতো রাতে?

কেনো আসতে মানা ছিলো নাকি?

না।

তবে?

রাজকুমার এখানে এভাবে আসাটা আপনার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

জানি।

তবু যখন তখন কেনো আসেন বলুন তো?

বলেছি তোমাকে ভাল লাগে তাই।

চলুন, ঘরে চলুন।

রাজকুমার জ্যোতির্ময় আর দিপালী এগিয়ে চলে দিপালীর কক্ষের দিকে।

তখনও কান্তা বার থেকে ভেসে আসছিলো—পুরুষ কণ্ঠের জড়িত হাসি আর গানের শব্দ। মাঝে মাঝে বোতলের টুন টান শব্দও শোনা যাচ্ছে।

জ্যোতির্ময় বললো—কান্তা বারের বন্ধু বান্ধব ছেড়ে নির্জনে কেন দিপালী?

আজ সন্ধ্যা থেকে মন ভাল নেই কিনা তাই। কুমার আপনি আর আসবেন না।

কেনো?

ভয় হয় আপনি কোন বিপদে পড়েন।

একটু হেসে বলে জ্যোতির্ময়—বিপদ! কিসের বিপদ?

আপনি জানেন—আমাদের কান্তা বারের কয়েকজন পুরোন লোক মারা পড়েছে—যেমন মোসলে উদ্দিন ও তার সহচরগণ। মীর্জা মোহাম্মদ আরও অনেকে......কি নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

আমি নিজ চোখে না দেখলেও অনুমানে বুঝতে পারছি কি ভয়ঙ্কর এই হত্যাকান্ড যা কল্পনা করা যায় না। না জানি কে সে নরঘাতক যার প্রাণে এতেটুকু মায়ার ছোঁয়াচ নেই। শুনেছি আরও তিনজন এইভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

হাঁ কাহাতু পর্বতের সুড়ঙ্গ পথে যখন কান্দাই মাল যাচ্ছিলো ঐ সময় কে বা কারা ট্রেনের মধ্যে তিন জনকে হত্যা করেছে।

আহা কত অসহায় অবস্থায় এদের হত্যা করা হয়েছে। এরা সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি ছিলো বলে মনে হয়।

রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের কথা শুনে বলে উঠে দিপালী—আপনি সরল সহজ মানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। এ কদিনে যারা এই নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তারা একটিও সৎ বা মহৎ ব্যক্তি নন। এরা জনসমাজে নামি দামি ব্যক্তি হলেও ভিতরে ভিতরে এরা দুষ্কৃতিকারীদের মূল স্তম্ভ। এরাই সমাজের এবং জাতীর কলঙ্ক...

দিপালী তুমি জানো আর জানোনা বলেই এদের দোষারুপ করছো। মীর্জা মোহাম্মদ ছিলেন একজন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

কুমার জ্যোতির্ময় এবং দিপালীর যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে হিম্মৎ খাঁ। কারণ যখন মোসিয়ে খানের সঙ্গে তার গোপন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন দিপালী কি কারণে সেখানে গিয়েছিলো এ ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছিলো তার মনে। তাই মোসিয়ে খানের ইংগিতে হিম্মৎ খাঁ এসেছিলো কন্যা দিপালীর কক্ষের দরজায়।

কানে এলো জ্যোতির্ময়ের কণ্ঠস্বর—তোমার বাবা একজন মহৎ সৎজন ব্যক্তি। কোন সময় তিনি মন্দ কাজ করতে পারেন না তেমনি পারেন না যারা আসেন তোমাদের এই কান্তা বারে।

এর বেশি শোনার সখ আর হলো না হিম্মৎ খাঁর। জ্যোতির্ময় এসেছে দিপালীর কক্ষে এ তাদের পরম সৌভাগ্য। এই রাজকুমার যেদিন থেকে কান্তা বারে পা দিয়েছে সেদিন থেকে কান্তা বারের অদৃষ্ট খুলে গেছে। পূর্বে যা আয় ছিলো তার চতুরগুণ আয় হচ্ছে এখন। জ্যোতির্ময় প্রতি রাতে দিপালীকে যে স্বর্ণমুদ্রা দান করে তা কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকার চেয়েও বেশি। হিম্মৎ খাঁ এ-কারণে জ্যোতির্ময় এর আসা যাওয়ায় কোন আপত্তি করতো না কোন সময় বরং খুশি ছিলো সে মনে মনে!

হিম্মৎ খাঁ জ্যোতির্ময়ের মুখে নিজের ও তার সহকারীগণের প্রসংশা শুনে খুশি হয়ে চলে যায়।

দিপালী বলে—কুমার আপনি জানেন না এরা কতখানি অসৎ ব্যক্তি। আমি এদের সবাইকে হাড়েহাড়ে চিনি। যারা ট্রেনের নিভৃত কামরায় নিহত হয়েছেন তারা তিন জনই বদলোক ছিলেন।

তাই নাকি?

হাঁ। যেমন আজ যিনি বাবার সঙ্গে গল্প করছেন জানেন তিনি কে?

তা আমি কেমন করে জানবো কে না কে তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করছেন?

উনি একজন নামি লোক। সবাই তাকে যথেষ্ট সম্মান করেন কারণ তিনি একজন মহৎ, পরোপকারী সমাজ সেবক বা দুঃস্থ জনগণের হিতাকাঙ্খী বন্ধু।

সত্যি। এমন এক মহান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুশি হতাম এবং নিজকে ধন্য মনে করতাম।

কিন্তু......কথাটা শেষ না করেই দিপালী খিল খিল করে হেসে উঠলো।

জ্যোতির্ময় বিস্ময় ভরা চোখে তাকালো দিপালীর মুখের দিকে। বললো—হাসছো যে বড়?

রাজকুমার সত্যি আপনি একজন অজ্ঞ ব্যক্তি।

কারণ?

কারণ আপনি আমার কথার কিছু বুঝতে পারেন নি।

দিপালী তুমি কি সব সময় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। সত্যি কি আমি অজ্ঞ, কিছু বুঝি না?

যদি এতো বোঝেন তাবে কেনো না বোঝার ভান করেন বলেন তো? মোসিয়ে খান একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক। কান্দাই শহরে তার বেশ কয়েকটা রাজপ্রাসাদ সম ইমারত আছে। আছে কিছু সংখ্যক গাড়ি ও ইন্ড্রাষ্ট্রিজ। এখনও তার গুদামে কয়েক লক্ষ মণ চাল গম মজুত আছে......

জ্যোতির্ময় তাকিয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে দিপালীর মুখের দিকে, বলে—তোমার বুঝি হিংসে হচ্ছে দিপালী?

কি যে বলেন আমার হিংসে হবে? সত্যি বলতে কি আমার কি মনে হয় জানেন—ওনাকে ঐ গুদামের বস্তার নিচে গুদামজাত করে রাখি। হয়তো তা হলে ওনার কিছুটা আশা পূর্ণ হবে।

কে বললো তুমি এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে হিংসে করছো না। বেচারী কত কষ্ট করে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মত কিছুটা জায়গা আর টাকা পয়সা করেছেন তা তোমার সহ্য হচ্ছেনা।

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন হিংসে নয় দুঃখ ব্যথা।

দুঃখ! ব্যথা! কিসের দুঃখ আর কিইবা ব্যথা?

এবার দিপালীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। বললো সে—কান্দাই বাসীদের জন্য বিদেশ থেকে যে সাহায্য দ্রব্য আসে তার তিন ভাগ আত্মসাৎ করেন এই মহান ব্যক্তি...শুধু ইনি নন এর মত আরও দশজন। তারপর বাকি এক ভাগ দেন দুঃস্থ জনগণের কল্যাণার্থে কিন্তু সেগুলোও তার নিম্নস্তরের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে কিছু সামান্য অংশ

আসে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে। তখন ঐ যৎ সামান্য সাহায্যদ্রব্য বণ্টন করতে গিয়ে দেখা যায় মারা-মারি, কাড়া-কাড়ি এমন কি খুনা খুনি......কুমার আপনি স্বচক্ষে যদি দেখতেন সেই সব অসহায় মানুষের করুণ মর্ম্মস্পর্শী চেহারা তা হলে অমন করে বলতে পারতেন না। দিনের পর দিন অনাহারে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে। পেটে অন্ন নেই পরনে বস্ত্র নেই অসুখে ঔষধ নেই অথচ তাদেরই মুখের আহার কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ আজ স্বনাম ধন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

দিপালী তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি দুঃস্থ জনগণের পরম বন্ধু। কিন্তু শুধু মুখে দুঃখ প্রকাশ করে কি লাভ হলো? পারবো তুমি বা আমি এদের কোন উপকার করতে?

হতাশ ভরা কণ্ঠে বলে দিপালী—সেই কারণেই তো এতে দুঃখ এতো ব্যথা আমার। আর সেই কারণেই আমি বারণ করি আপনি এখানে আসবেন না। এখানে কোন ভাল মানুষ আসেনা।

দিপালী কি যে বলছিলে, এখনও তার গুদামে কয়েক লক্ষ মন চাল-গম মজুত আছে...

হাঁ মোসিয়ে খান বাবাকে বলছিলেন তার গুদামে এখন বহু মাল আছে আগামীকাল রাত তিনটায় গাড়ি যাবে সেই গাড়ি ভর্তি মাল উঠবে তারপর রাতের অন্ধকারে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাবে কান্দাই থেকে। গাড়িতে রেডক্রসের চিহ্ন থাকবে তাহলেই জনগণ বুঝতেও পারবেনা কিছু...

জ্যোতির্ময় দু'চোখ কপালে তুলে বললেন—আশ্চর্য বুদ্ধিমান লোক মোসিয়ে খান। রেডক্রসের মার্কা থাকলে কেউ কোন সন্দেহ করবেনা মনে করবে বিদেশ থেকে মাল আসছে তাই না?

হাঁ এই রকমই বুদ্ধি এটেছেন ঐ মহান ব্যক্তিটি আমার বাবাও তারই দলের একজন।

যাক ও সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বলো? এসেছি যখন একটি গান শোনাবেনা দিপালী?

এতো রাতে গান শোনার সখ হয়েছে রাজকুমার?

হাঁ তাই তো ছুটে এসেছি কান্তা বারে। দিপালী এখন রাত কত?

রাত অনেক হয়েছে রাজকুমার। আপনার যাবার সময় হয়েছে।

যদি না যাই?

না এখানে থাকা ঠিক হবে না আপনার। আপনি চলে যান। এ বিষাক্ত পুরিতে আপনাকে আমি থাকতে দেবোনা। রাজকুমার দিন দিন আমি এই কান্তা বারে হাঁপিয়ে উঠছি।

কেনো?

আপনি কি জানেননা এখানে কত কষ্টে আছি। প্রতিদিন আমাকে কত জনের মন তুষ্টি করতে হয়। আমি আর পারছিনা এই দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে।

হাঁ সেই কারণেই তো আমি তোমাকে চাই দিপালী। তুমি শুধু আমার হবে। শুধু আমার হবে দিপালী...

জ্যোতির্ময় দিপালীকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে কানে ভেসে আসে একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ।

জ্যোতির্ময় চমকে উঠে—দিপালী এ কিসের শব্দ।

দিপালী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—আজ আবার কোন হত ভাগ্যকে কান্তা বারের অন্ধকার কক্ষে বন্দী করা হলো।

জ্যোতির্ময়ের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

দিপালী বলে—রাজকুমার এই কান্তা বারের অভ্যন্তরে কত যেন নৃশংস কাজ প্রতিদিন সমাধা হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবোনা। কত মহৎ মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে গোপনে ধরে এনে এখানে তাদের আটক করে রাখা হচ্ছে এবং তাদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন।

আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করে জ্যোতির্ময়—এ সব করে কি লাভ তোমাদের।

সৎ মহৎ ব্যক্তিদের দেশ থেকে সরিয়ে ফেলাই হলো আমাদের মূল উদ্দ্যেশ্য। রাজকুমার যেমন আপনাকে আমরা হাতের মুঠায় নিয়ে পুতুল নাচ নাচাচ্ছি।

দিপালী!

সত্যি রাজকুমার আপনি একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন আমার কথা সত্যি কিনা। বিদেশী একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেওয়ার গোপন সে ষড়যন্ত্র।

দিপালী আমি ঠিক তোমার কথাগুলো বুঝতে পারছি না। একটু খোলাসা বলবে কি?

রাজকুমার আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নাই তবে...

থাক তবে বলো না।

না না বলবো কিন্তু যদি আমাদের দলের কেউ জানতে পারে তা হলে।

বিপদ তোমার অনিবার্য এই তো? কিন্তু মনে রেখো দিপালী আমি তোমাকে উদ্ধার করবোই করবো—এই কান্তা বারে আর তোমাকে পঁচে মরতে দেবোনা।

সত্যি।

হাঁ সত্যি। এবার বলো কি সে কথা যা বলতে তোমার এতো বাঁধছে?

ও তেমন কিছু না।

তবু বলো দিপালী?

জ্যোতির্ময় ওকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে মুখ খানা তুলে ধরে।

দিপালী ওর ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকায় রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের মুখে, বলে সে ধীরে ধীরে—বিদেশী কোন চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। তারা কান্দাই বাসীর সর্বনাশ করে নিজেরা বাঁচতে চায়। কান্দাই বাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বাঁচতে চায় তারা। এরই একটি বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে...যা আপনি বুঝতে পারবেন না।

দিপালী ঠিক বুঝতে পারছিনা আরও একটু খুলে বলো না?

বলছি শুনুন কিন্তু বাহিরটা একবার দেখে আসুন। রাজকুমার যদি কেউ আমাদের লোক ওৎ পেতে আমাদের সব কথা শোনে।

বেশ আমি যাচ্ছি এক্ষুণি দেখে আসছি। কেউ বাইরে আছে কিনা। জ্যোতির্ময় বেরিয়ে যায় একটু পরে ফিরে আসে—না কেউ নেই বাইরে।

দিপালী বলে—দেখুন রাজকুমার ষড়যন্ত্র যদি না হতো তবে কেন দেশের লোক হয়ে দেশের মানুষের সর্বনাশ করবে। কেন নিজেদের মুখের আহার চুরি করে বাইরে চালান করবে। কেনো সৎ মহৎ ব্যক্তিদের মাথায় বদনামের বোঝা চাপিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হবে। কেন—কিসের জন্য দেশের মানুষ হয়ে দেশের মানুষের টুটি ছিড়ে ফেলছে? শুষে নিচ্ছে একজন আর এক জনের বুকের রক্ত। সব ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত।

দিপালী।

হ্যাঁ আমি সব জানি।

জানো সব জানো তুমি?

জানি অনেক বন্ধু জুটেছে আমাদের তারা বিড়াল তপস্বী সেজে আমাদের তাজা রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে। যেমন আমি জানি আমার বাবা এ দেশীয় নয় কিন্তু সে এখন এই কান্দাই শহরের একজন নামী লোক। কান্দাই উচ্চ স্তরের লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশা এমন কি এক আত্মা বলা চলে। এমনি বহু লোক ধরে আছে যারা কান্দাই বাসী নয় অথচ কান্দাই শহরে তারা বহুকাল ধরে বসবাস করছে এবং কান্দাই এর একজন হিতাকাঙ্খী সেজে বসেছে এরাই গোপনে দেশের মহান ব্যক্তিদের হাত করে তাদেরই মা ভাই বোনের মুখের আহার গোপনে সংগ্রহ করে চালান দিচ্ছে নিজের দেশে। উদ্দেশ্য কান্দাই বাসীকে অন্তঃসারশুন্য করে নিজের দেশের জনগণের উদর পূর্ণ করা।

দিপালী তুমি এতো জানো। সত্যিই তুমি বুদ্ধিমতি নারী।

রাজকুমার জানি না বুঝি না তবু অনুমান করি! সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন মোসলে উদ্দিন তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কান্দাই এর একজন বাসিন্দা—কেনো তিনি গোপনে কান্দাই এর খাদ্য শস্য হরণ করে বাইরে পাঠাতেন। শুধু মোসলে উদ্দিন নন ধরুন মীর্জা মোহাম্মদ তিনিও তো একজন কান্দাই এর নাগরিক কিন্তু কেনো তিনি বিদেশী চক্রান্তে আত্মহারা হয়ে দেশের সর্বনাশ করতেন। এমনি শত শত জ্ঞানী বুদ্ধিমান স্বনামধন্য ব্যক্তি সার্থান্ধ হয়ে নিজের পায়ে আজ কুঠার

মারছেন। দেশের সামগ্রী গোপনে পরের হাতে তুলে দিয়ে নিজের মা-বোন সন্তানদের মুখে কষাঘাত করছেন। কেনো আজ যারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে তারা কি মোসলে উদ্দিনের মা বোন সন্তান নন? তারা কি মীর্জা মোহাম্মদের ভাই, ভাইপো বা বোনের ছেলে নয়। হতে পারে তারা নামি দামী কিন্তু যারা না খেয়ে মরছে তাদেরই একজন।

দিপালী তোমার কথা গুলো নিখুঁত সত্য।

দিপালী বলেই চলেছে—কেনো দেশের মানুষ এটুকু বোঝেনা? বোঝার মত কি এতোটুকু অনুভূতি নেই তাদের মধ্যে।

থাকলে হয়তো এমন ভুল করতেন না। বললো জ্যোতির্ময়।

দিপালী এবার দাঁতে দাঁত পিষে বললো—বিদেশীরা বন্ধু সেজে বুকের রক্ত নিংড়ে খাচ্ছে অথচ দেশের মানুষ তাদের খেলার পুতুল বনে গেছে। যে ভাবে নাচাচ্ছে তারা সেই ভাবে নাচছে। মনে করেছে আমার মস্ত জিতে যাচ্ছি। কিন্তু ওরে নরাধম তোমরা যে নিজেদের দেহের মাংস নিজেরা কামড়ে খাচ্ছো সে হিসাব রেখেছো?

জ্যোতির্ময় বললো—বিদেশী চক্রান্ত এরই নাম। নিখুঁতভাবে তারা অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালন করে চলেছে। কারণ তারা বুদ্ধিমান....

আমাদের দেশের মানুষ বড় বেঈমান স্বার্থপর তাই সব সময় নিজের উদর পূরণে ব্যস্ত তারা কোন কথা তলিয়ে ভেবে দেখেন বা ভেবে দেখবার মত সময় করে না, কিসে নিজেদের ইমারত গড়ে উঠবে, কিসে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়াবে কি করে ঐশ্বর্যের পর্বত গড়ে উঠবে সব সময় ঐ চিন্তায় মগ্ন সবাই। নিজেদের স্বার্থের জন্য দুঃস্থ আপন জনদের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই কারো।

যাক ও সব কথা এবার বলো দেখি একটু পূর্বে আর্তস্বর শুনতে পেলাম কার কণ্ঠের সে ধ্বনি?

আমিও ঠিক জানিনা তবে শুনেছিলাম কোন এক বুদ্ধিজীবিকে তারা আজ চুরি করে আনবে।

বুদ্ধিজীবি!

হাঁ শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান তাই আমি তাকে বুদ্ধিজীবি বলে থাকি।

কি অপরাধ ছিলো তার?

অপরাধ তিনি নাকি মোসিয়ে খান সম্বন্ধে কোন রকম অসৎ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন দেশের জনগণ যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে মৃত্যু প্রায় এমন দিনে মোসিয়ে খানের গুদামে লক্ষ লক্ষ মন চাউল...

সর্বনাশ সত্যিই এ ধরনের কথা বলা বড় অন্যায় হয়েছে।

সত্য কথা বলেছিলেন বলে তার অন্যায় হয়েছে। রাজকুমার আপনারা সুখী মানুষ দুঃস্থ জনগণের দুঃখ ব্যথা বুঝতে পারবেন না।

সে বুদ্ধিজীবিটিকে কোথায় কি ভাবে রাখা হলো নিশ্চয়ই তুমি জানো দিপালী?

হাঁ চোখে না দেখলেও জানি। যেখানে রাখা হয়েছে সেই অজানা ভদ্রলোকটিকে।

অজানা ভদ্রলোক।

হাঁ আপনাকে একদিন বলেছিলাম হয়তো ভুলে গেছেন। এক অজানা ভদ্রলোক তিনি। কোনদিন তাকে কান্তা বারে দেখিনি হঠাৎ এসেছিলেন এখানে। জানিনা কে তিনি তাকে দেখে কান্তা বারের শয়তানগুলো কানা কানি শুরু করেছিলো। আমি বুঝতে পেরে তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। তাকে কৌশলে আটক করে ছিলো কান্তা বারের শয়তানগুলো।

হাঁ এবার মনে পড়েছে ভদ্রলোকটিকে তুমি ভালও বেসেছিলে অল্পক্ষণের মধ্যে।

মিথ্যে নয় রাজকুমার ওকে আমার ভাল লেগেছিলো। সত্যি তার অবস্থার কথা স্মরণ হলে ব্যথায় আমার বুক ফেটে যায়। আপনি যদি তার অবস্থা দেখতেন কিছুতেই চোখের পানি রাখতে পারতেন না কি নৃশংস দৃশ্য। আজ দুই দু'টো মাস বেচারীকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাকে দু'বেলা দু'টো শুকনো রুটি খেতে দেওয়া

হয় আর দু'গেলাস পানি। প্রতিদিন তাকে বেত্রাঘাত করা হয়। বেচারীর জামা কাপড় ছিড়ে দেহের নানা স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে...উঃ কি ভয়ঙ্কর সে অবস্থা।

জ্যোতির্ময়ের চোখ দু'টো বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠে। বলে সে—দিপালী তুমি নিজের চোখে তার এ অবস্থা দেখেছো?

হ্যাঁ রাজকুমার।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে সেখানে?

সেই দুর্গম স্থানে যাবেন আপনি?

হ্যাঁ দিপালী আমার বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কিন্তু...

বলো থামলে কেনো?

সে স্থানে আপনি যেতে পারবেন না।

কেনো?

অত্যন্ত দুর্গম স্থান।

হোক তবু আমি যাবো দেখবো তাকে। বলো দিপালী আমাকে তুমি নিয়ে যাবে সেখানে।

যদি আমার বাবা কিংবা কান্তা বারের কেউ জানতে পারে তাহলে আমিও মরবো আপনিও মরবেন...

বেশ তো এক সঙ্গে মরতে পারলে অনেক খুশি হতাম কারণ আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবোনা কোনদিন। দিপালী বিশ্বাস করো আমি শুধু একটিবার সেই হতভাগ্যকে দেখতে চাই। কথা দাও আমাকে নিয়ে যাবে?

জ্যোতির্ময়ের আব্দার দিপালী অগ্রাহ্য করতে পারলো না কথা দিলো নিয়ে যাবে সে একদিন কান্তা বারের অভ্যন্তরে সেই অন্ধকারময় গোপন কক্ষে।

এক সময় জ্যোতির্ময় বিদায় গ্রহণ করলো। দিপালী ওকে গাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে এলো।

❑

প্রকাশ্য দিবালোকে দু'খানা গাড়ি এসে থামলো মোসিয়ে খানের গুদামের সম্মুখে। গাড়ি থেকে নামলো প্রায় বিশ পঁচিশ জন বলিষ্ঠ লোক। সবার দেহেই পুলিশের ড্রেস।

ওরা কান্দাই পুলিশ ফোর্স তাতে কোন সন্দেহ নাই। সবার হাতেই রাইফেল, মেশিন গান। দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গুদামে প্রবেশ করলো।

একজন হুইসেল দিলো সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুলিশ বাহিনী গুদামের দরজা খুলে বস্তা বস্তা চাল গম টেনে বের করে আনলো বাইরে।

আশ্চর্য অল্পক্ষণের মধ্যে অগণিত দুঃস্থ নারী-পুরুষ এসে জমায়েত হলো মোসিয়ে খানের গুদামের সম্মুখে।

পুলিশ বাহিনী বস্তা বস্তা চাল গম বিলিয়ে দিতে লাগলো। তাদের মধ্যে।

প্রায় ঘন্টা খানেকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মন চাউল আর গম শেষ হয়ে গেলো। কেউ বা গাড়ি বোঝাই করে চাল নিয়ে গেলো। কেউ বা ঘোড়ার পিঠে বস্তা তুলে, কেউ বা কাধে বা মাথায় করে।

মোসিয়ে খানের লোকজন কর্মচারী কেউ কোন কথা বলতে পারলোনা বা বলতে সাহসী হলোনা।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেও কারো কাছে কোন জবাব পেলোনা। তিনি তখন মোসিয়ে খানের কাছে ফোন করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফোন করবার পূর্বেই একজন পুলিশ ফোনটা রিসিভার সহ তুলে নিলো হাতে। আর একজন তার পিঠে রাইফেলের ঠান্ডা আগাটা চেপে ধরে রইলো।

কাজ শেষ হতে বেশিক্ষণ বিলম্ব হলো না। সমস্ত গুদাম শূন্য হয়ে গেলো। রিসিভার ম্যানেজারের হাতে তুলে দিয়ে বললো পুলিশটি—নিন মালিককে জানিয়ে দেন তার গুদাম ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে।

ম্যানেজার বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে।

মোসিয়ে খান সবেমাত্র কাপড় চোপড় খুলে বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলেন ঠিক ঐ মুহূর্তে ম্যানেজারের ফোন পেলেন......স্যার শীঘ্র চলে আসুন...গুদামের সমস্ত মাল লুট হয়ে গেছে...

দুচোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো ম্যানেজারের বলেন কি তার গুদামে লক্ষ লক্ষ মন মাল রয়েছে—সব মাল লুট হয়ে গেছে এটা কি স্বপ্ন না সত্য কথা।

জামা কাপড় পুনরায় গায়ে চড়িয়ে ছুটলেন গুদাম অভিমুখে। গাড়ি যখন গুদামের দরজায় এসে পৌঁছলো তখন গুদামের শ্রমিক এবং কর্মচারীগণ কালো মুখে ছুটে এলো তারা কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা খুলে বললো।

পুলিশ বাহিনী এসে নিজের হাতে তার গুদাম খুলে গুদামের সমস্ত মাল দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে এ কথা একেবারে অবিশ্বাস্য তবু বিশ্বাস না করে কোন উপায় নাই।

মোসিয়ে খাঁন নিজের মাথার চুল টানতে লাগলেন এমন কি পুলিশ অফিসে ফোন করে জানাবেন তারও শক্তি দেহে নাই। তবু ফোন করলেন পুলিশ প্রধান মিঃ জায়েদীর কাছে।

মিঃ জায়েদী সংবাদ শুনে একেবারে বিস্মিত হতবাক হলেন, তিনি জানিয়ে দিলেন এ ধরনের কাজ পুলিশ বাহিনী করতে পারেনা।

❑

গভীর রাত। মোসিয়ে খান তার কক্ষের মেঝেতে পায়চারী করছিলেন চোখে মুখে তার দারুন চিন্তার ছাপ। প্রায় উন্মাদের মত পড়েছেন, কারণ কোটি কোটি টাকার মাল আজ তার গুদাম থেকে উধাও হয়েছে। মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে তার। নিজে গিয়েছিলেন পুলিশ অফিসে কিন্তু পুলিশ মহল্ল এর কোন বিহিত ব্যবস্থা করতে পারেনি।

এই ঘটনার পর একেবারে মুষড়ে পড়েছেন মোসিয়ে খান। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন এসে অনেক বুঝিয়েছেন, সান্তনা দিয়েছেন কিন্তু কোন সান্তনাই তাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি।

বন্ধু বান্ধব সবাই চলে গেছেন বিদায় নিয়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে যে যার কক্ষে। শুধু মোসিয়ে খান এর চোখে ঘুম নাই।

এতোগুলো মাল, এতোগুলো অর্থ আজ তার হস্তচ্যুত হয়ে গেলো এ দুঃখ সামলানো কম কথা নয়।

সমস্ত রাত কাটলো......

সকালে অনেক বেলা হয়ে গেলো তবু মোসিয়ে খানের ঘুম ভাংলোনা।

দরজায় ডাকা ডাকি তবু কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রথমে সবাই মনে করলো মোসিয়ে খান সারারাত অনিদ্রার পর ভোরে খুব করে ঘুমাচ্ছেন।

কিন্তু যখন এতো ডাকাডাকির পর তার ঘুম ভাংলো না তখন দরজা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলো অনেকে।

দরজা ভেঙ্গে ফেলতেই সবার চক্ষুস্থির।

মোসিয়ে খানের সমস্ত হীন দেহটা চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আছে। ঠিক তার কোলের উপর তারই মাথাটা যত্ন সহ রাখা হয়েছে। রক্তে চুপসে গেছে মেঝের কার্পেটখানা।

মাথায় করাঘাত করে বেগম মোসিয়ে খান রোদন জুড়ে দিলেন। শুধু গুদামের মালই হারালেন না তিনি হারালেন স্বামী রত্নটিকে।

পুলিশ এলো।

নানাভাবে তদন্ত শুরু হলো কিন্তু কে বা কারা মোসিয়ে খানকে এভাবে হত্যা করেছে তার কোন সন্ধান পাওয়া গেলোনা।

খবর পেয়ে হিম্মৎ খাঁ এসে হাজির হলো। মোসিয়ে খানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে মুখ তার মরার মুখের মত বিকৃত হলো। বেশিক্ষণ সে এই দৃশ্য দেখতে পারলোনা প্রাণ ভয়ে পালালো কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে।

পুলিশ মহল মোসিয়ের লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বিদায় নিলেন।

এ হত্যাকান্ডের সংবাদ এক সময় পৌছলো শহরের ঘরে ঘরে।

হোটেল, রেস্তোরা, সিনেমা হলে, ক্লাবে সব জায়গায় এই মস্তক হীন হত্যালীলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

কান্তা বারে জ্যোতির্ময় আর দিপালী প্রেমালাপে মত্ত ছিলো। তারা এই নৃশংস হত্যা লীলার কথা এখনও শোনেনি হয়তো তাই তারা খুশি মনে নানারকম হাসি তামাসা করছিলো।

হঠাৎ হিম্মৎ খাঁ এসে দাঁড়ালো সেখানে, তার চোখে মুখে দারুন উৎকণ্ঠার ছাপ। এসে বললো সে—দিপালী আজ কান্তা বার বন্ধ থাকবে।

দিপালী পিতাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো—কেনো?

মোসিয়ে খান নিহত হয়েছে।

বলো কি বাবা?

হাঁ দিপালী কোন দুস্কৃতিকারী তার দেহ থেকে মাথাটা কেটে আলাদা করে ফেলেছে। গতকাল তার গুদাম লুট হয়েছে। কে বা কারা তার সব মাল গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

বাবা গরিবরা খেতে পায়না, না হয় তা দিলো কিন্তু তাকে হত্যা করলো কারা?

দিপালী দেশটা দুস্কৃতিকারীতে ভরে গেছে। শুধু খুন হত্যা খুন হত্যা......

জানিনা বাবা কখন তোমার আমার ভাগ্যে কি ঘটবে। ভয় হয় বাবা তোমাকে নিয়ে।

হিম্মৎ খাঁ বলে উঠে—ভয় করবো আমি! দুনিয়া যদি উলটে যায় তবু কোন বেটা আমার গায়ে হাত দিতে পারবেনা। আমি আমার কান্তা বারের গোপন কক্ষে থাকবো।

চলে যায় হিম্মৎ খাঁ।

দিপালী বলে—রাজ কুমার আপনি এবার চলে যান। এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

জ্যোতির্ময় দিপালীর কপাল থেকে চুলগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো—তুমি যে সেদিন কথা দিয়েছিলে সেই দুর্গম অন্ধকার কক্ষে আমাকে নিয়ে যাবে?

কিন্তু......

কোন কিন্তু নয় দিপালী......

দিপালী আর জ্যোতির্ময় এগিয়ে চললো। সমস্ত কান্তাবার নিস্তব্ধ কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই।

দিপালী এগিয়ে চলেছে সুড়ঙ্গ পথে।

জ্যোতির্ময় তাকে অনুসরণ করে চলেছে। আধো অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। দিপালী হাত বাড়ালো জ্যোতির্ময়ের দিকে।

জ্যোতির্ময় ওর নরম হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো একটা তীব্র আর্তনাদ।